গোটা মানুষ

উপন্যাস

"The world is full of wonders but
nothing is more wonderful than Man."
—Sophocles

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা পরাগ প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দাঁ
১৬৯, বর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট।

কাগজ সরবরাহে সহায়তা করেছেন বেঙ্গল পেপার মিলসের
শ্রীপ্রতাপ কুমার সিংহ।

সমর্পণ

নবীন বাঙ্গলার

স্বনামধন্য তেজস্বী পুরুষ

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে

অশেষ শ্রদ্ধা সহকারে

এই গ্রন্থখানি সমর্পণ করিয়া

ধন্য হইলাম

পরিচয়

'গোটা মানুষে'র প্রথম সংস্করণ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংস্করণটি বেঙ্গল পাবলিসার্সে'র সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

বইখানি প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বে নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরায়-মূলক পরিস্থিতির জন্য পুনঃ প্রকাশে অযথা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আরও কয়েকখানি গ্রন্থের প্রকাশ সম্পর্কেও অনুরূপ দুর্ভোগ ঘটিয়াছে।

আশ্বিন, ১৩৫২
নাট্য-ভারতী
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট : কলিকাতা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গোটা মানুষ

——:*:——

এক

অসহযোগ আন্দোলনের ভরা জোয়ার তখন চলিয়াছে। তাহার প্রবল স্রোত রাজনীতির ক্ষেত্রগুলি ছাপাইয়া শিক্ষায়তনের অঙ্গনে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবকদের চিন্তার অন্ত নাই। ভবিষ্যতের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাঁহারা সেই উদ্দাম স্রোতের মুখে আলের আকারে আড় হইয়া পড়িয়াছেন—ছেলে-মেয়েরা যাহাতে স্রোতে পড়িয়া কুটার মত ভাসিয়া না যায়। কিন্তু আলের পাশ কাটাইয়া যে কয়টি ছেলে স্রোতের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এলাহাবাদ গভরমেণ্ট কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অতুল চৌধুরীর নামটিই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই ছেলেটি ধনীর পুত্র এবং বর্ত্তমানে পৈতৃক বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। যাহারা আগেই কলেজ ছাড়িয়াছিল, আর যাহারা ছাড়িব ছাড়িব করিয়াও অভিভাবকদের ভয়ে ছাড়িতে পারিতেছিল না, তাহারা সকলেই অতুলকে বাহোবা দিল। আহ্লাদে আটখানা হইয়া সে তখন এই ত্যাগের ব্যাপারটি জানাইবার জন্য রেবাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোটা মানুষ

শহরের মহিলা কলেজের ছাত্রী রেবা। ছেলেদের হাঙ্গামার হিড়িকে তাহাদের কলেজ বন্ধ থাকায় সে তখন বাহিরের ড্রয়িং রুমে পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছিল।

অতুল ঘরে ঢুকিয়াই ব্যগ্র উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল: হ্যাল্লো!

সে স্বরে রেবার ক্ষীণ কণ্ঠের সুর ডুবিয়া গেল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে হাসি মুখে বলিল: শুনিছি অতুলবাবু, কলেজ তুমি ছেড়ে দিয়েছ! গুড্ নিউজ রিয়েলী। কাল আমাদের কলেজ খুলছে। আমি আগেই নাম কাটাবো জেনো।

সামনের চেয়ারখানায় বসিয়াই অতুল বলিল: থ্যাঙ্কস্! আমিও ঠিক এই কথাটা শুনবো বলেই ছুটে এসেছি। জানি, আমার একজ্যাম্পল তুমি ফলো করবেই।

স্বরে জোর দিয়া রেবা বলিল: সার্টেনলি। এখন আর মহেন্দ্রবাবুর যুক্তি খাটছে না।

সুন্দর মুখখানা বিকৃত করিয়া অতুল বলিল: সে রাস্কেলটার কথা ছেড়ে দাও। তার জন্যই ত আমাদের 'লেট' হয়ে গেলো—পিছিয়ে পড়তে হোল, নৈলে আমরাই ত এ-ব্যাপারে 'ম্যাগ্রেসর' বোলে নাম বাজাতে পারতুম! আর, তুমিও দোটানায় পড়ে থেমে গেলে! তখন ভাবলে না যে ও হতভাগাটার কথার কোন দামই নেই!

মনে মনে কি ভাবিয়া রেবা বলিল: দাম না থাকুক, কিন্তু তার কথাগুলোর যে বেশ হুল আছে, তাতে ভুল নেই। যদিও মহেন্দ্রবাবু কেনিয়ে কথা বলে না, তবুও তার প্রতি কথাটি মনে বিঁধে যায়—অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তার জ্বালা থাকে।

গোটা মানুষ

অতুল দেখিল, কথায় কথায় আবার সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে, যাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। কাজেই প্রসঙ্গটির মোড় ফিরাইবার জন্য সে বলিল: তাহলে কলেজে গিয়েই নাম কাটাচ্ছ ত?

মুখখানা শক্ত করিয়া রেবা উত্তর দিল: শুধু নাম কাটানো নয় মশাই, আমাদের ক্লাসের সব কটা মেয়েকে দলে ভিড়িয়ে কলেজকেই বয়কট করবো।

রেবার কথার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। আগন্তুক মহেন্দ্র, ইহাদের কথা প্রসঙ্গে এই ছেলেটীর কথাই এই মাত্র শোনা গিয়াছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই একখানা চেয়ারে বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিল: ব্যাপার কি? অতুল ল্যাজ কেটেই বুঝি তোমাকেও দলে ভেড়াতে এসেছে রেবা,—আর তুমিও অমনি ওর কথায় নেচে উঠে ছুরি সানাতে সুরু করে দিয়েছ?

মহেন্দ্রের কথায় অতুল জ্বলিয়া উঠিবার মতন হইয়া বলিল: ভয় নেই, তোমার ল্যাজে ছুরি পড়বে না, তুমি সল্যাজে আর নির্লজ্জ ভাবেই কলেজে হাজির থেকো; কিন্তু আমাদের ব্যাপারে হাত দিও না—এই অনুরোধ।

রেবা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। অতুলের কথার পীঠেই শ্লেষের সুরে বলিয়া উঠিল: তুমি একাই কলেজের শোভা বর্দ্ধন করতে থাক মহেন্দ্র বাবু, সেটা খুবই শোভন হবে!

কাহারও কথা গায়ে না মাখিয়া মহেন্দ্র বেশ সহজ সুরেই বলিল:

গোটা মানুষ

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সব কিছু ছেড়ে কলেজের উপরেই তোমাদের এত আক্রোশ কেন? কলেজগুলো কি অপরাধ করেছে?

মহেন্দ্রের কথার উত্তরে অতুল এক লম্বা বক্তৃতা দিয়া ফেলিল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ঘোষণা, সত্যাগ্রহীদের দলে দলে কারাবরণ, দেশের অবস্থা প্রভৃতি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে করিতে তাহার সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। রেবা মুগ্ধভাবে সেদিকে চাহিয়া তাহার সেই দৃপ্ত উক্তিগুলি যেন গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। বক্তৃতা শেষ হইলে উভয়েই মহেন্দ্রের সেই স্বাভাবিক সরল সৌম্য মুখখানির দিকে কটাক্ষ-পাত করিল।

মৃদু হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল: সবই ত বল্‌লে অতুল, কিন্তু কলেজ-গুলোর কি অপরাধ, সেইটিই শুধু বাদ দিয়ে গেলে!

রেবা একটু খরস্বরেই বলিল: কেন, অতুলবাবুর কথাতেই ত তা স্পষ্ট বোঝা গেল। কথাটা এই, এখন দেশের কাজ করবার সময়; কলেজের ক্লাসে ব'সে প্রফেসরদের লেকচার নোট করবার সময় নয়। আমাদের সবারই কর্ত্তব্য, এখন কলেজগুলোকে বয়কট করা।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল: "আচ্ছা আমাকে বুঝিয়ে দেবে রেবা, দেশের কাজটা কি?

অতুল ক্রোধে টেবিলের উপর প্রবলবেগে একটি মুষ্টি প্রয়োগ করিয়া বলিল: নন্‌সেন্স! তুমি দেখছি, নিরেট নির্ব্বোধ, কিম্বা ভয়ঙ্কর দেশদ্রোহী—

মহেন্দ্রের সৌম্য মুখখানিও যেন একবার ক্ষণিকের জন্য দৃপ্ত হইয়া

উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সম্বরণ করিয়া সে বলিল : শেষের কথাটি তোমার প্রত্যাহার করা উচিত অতুল, তবে তোমার গোড়ার কথা আমি অস্বীকার করছি না।

অতুলের উত্তেজনা তখনও উপশমিত হয় নাই। উষ্ণভাবেই বলিল : আচ্ছা, তাই না হয় করা গেল, কিন্তু তুমি নির্ব্বোধ—নির্ব্বোধ—নির্ব্বোধ।

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল : আমি ত একথা আগেই স্বীকার করেছি ভাই, তাই না জানতে চাইছি তোমাব কাছে, দেশের কাজটি কি ?

অতুল বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিল : দেশেব কাজ বলতে বুঝতে হবে, দেশের জন্য দেশবাসীর কাজ, আর তাইতেই দেশের লোকের সুখ সুবিধা স্বার্থ সব। এই যে আন্দোলন—এর উদ্দেশ্য কি ? দেশের মুখ যাতে রক্ষা হয়, দেশের পয়সা যাতে দেশে থাকে, দেশের লোক স্বচ্ছন্দে দেশের পয়সা ভোগ করতে পারে, অনাহারে অনশনে না মবতে হয়, তার জন্যই এই আন্দোলন, আর এই হচ্ছে—আমাদের কাছে দেশের কাজ।

রেণা হাসিয়া বলিল : এবার বুঝতে পারলে মহেন্দ্রবাবু ?

অতুল গর্ব্বভরে মহেন্দ্রের উপর কটাক্ষ করিয়াই রেবাব মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

মহেন্দ্র অবিচলিত স্বরে বলিল : চমৎকার কথাগুলি বলে গেলে, শুনতেও লাগল বেশ। এখন এইটুকু আমাকে বুঝিয়ে দাওত ভাই, আজ যদি তোমার এই দেশের কাজের জন্যে দেশ থেকে স্কুল কলেজগুলো সব উঠে যায়, তা হলে দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার পবিত্র ব্রত যাঁরা স্বেচ্ছায় নিয়েছেন, আর এইটিই যাঁদের জীবিকার একমাত্র উপায়, তাঁদের বেকার অবস্থাটা দেশের কাজের কোন্ ধারায় এসে দাঁড়ায় ?

গোটা মানুষ

রেবা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল : এইবার অতুলবাবু- জবাব দাও ; মহেন্দ্রবাবুকে যতখানি বোকা ভাব, তা কিন্তু নয়।

অতুল মুখ লাল করিয়া বলিল : ও কথার কোন মানে নেই। উপজীবিকার কথা জোর করে টেনে আনলে দেশের কাজ হয় না। ওর কথা ছেড়ে দাও, এখন তুমি কি করবে বল ? কলেজ ছাড়ছ ত ?

রেবা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল : কলেজ ছাড়াটাই তাহলে তোমার মতে অন্যায়—কি বল মহেন্দ্র বাবু ?

মহেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিল : ন্যায় অন্যায় নিয়ে বিচার আমি করছি না, নিজের সম্বন্ধে আমি শুধু বলতে চাই—হুজুগে পড়ে কলেজ ছাড়বার মত দুর্ব্বলতা যেমন আমার আসেনি তেমনই তার আবশ্যকও আমি দেখছি নে।

রেবা বলিল : তাহলে আমার সম্বন্ধে তোমার কি মত ? কলেজ ছাড়ব কি না ?

মহেন্দ্র বলিল : আমার মতে তুমি যদি কলেজে মোটেই না ঢুকতে, তাতে তোমার ভবিষ্যৎ ভালই হ'ত। কিন্তু এখন যদি এই সাময়িক উত্তেজনার বশে কলেজ ছাড়তে চাও, সেটা উচিত নয়, বরং অন্যায়—

রেবা কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আর অতুল গুম্ হইয়া বসিয়া মহেন্দ্রের সম্বন্ধে রেবার আগের কথাগুলিই ভাবিতে লাগিল—তার কথাগুলির মূল্য না থাকিলেও রীতিমত হুল আছে।...সেই হুল কি রেবার মনে বিঁধিয়া মত বদলাইয়া দিল ?

° ° °

রেবা ধনীর কন্যা। তাহার পিতা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী অভ্রের ব্যবসায়ে

গোটা মানুষ

অল্পদিনের মধ্যেই যেমন হঠাৎ বড় মানুষ হইয়াছিলেন, তেমনিই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক সভ্যতার আপাতমধুর রীতি নীতি-গুলিরও হুবহু অনুকরণ করিয়া এলাহাবাদের প্রাচীনপন্থী ও নব্যতন্ত্রী উভয় সম্প্রদায়কেই চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় স্বামীর ইচ্ছানুসারে নূতন প্রথায় সংসারটি পাতিবার সময় সনাতন অনুষ্ঠান ও বিধিব্যবস্থাগুলির মোহ পত্নী নিস্তারিণীকে কতকটা অভিভূত করিলেও, চক্রবর্ত্তী মহাশয় অকাট্য যুক্তির দ্বারা সহধর্ম্মিণীর ভাবপ্রবণ চিত্তের উপর ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। পত্নীকে তিনি সহজভাবেই বুঝাইয়াছিলেন, "ধন ঐশ্বর্য্য পাবার কামনাতেই লোকে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে, আজ লক্ষ্মী পূজো, কাল শিবরাত্রি, পরশু সত্যনারায়ণ, এর আর বিরাম নেই, একটার পর একটা লেগেই থাকে! ভাগ্যবশে আমরা যে ঐশ্বর্য্য পেয়েছি, তিন পুরুষ ব'সে ব'সে বড়লোকের হালে কাটালেও ফুরোবে না, তবে এ সব বালাই নিয়ে আমরা ব্যস্ত হব কেন? দেশের মধ্যে বড়লোক ব'লে নাম কিনতে হ'লে, এ সব চলবেনা। এর চেয়ে বড় বড় কাজে হাত দাও, খরচ যদি করতেই হয়, বুঝে সুঝে এমন জায়গায় কর, যাতে নাম জাহির হয়ে পড়ে, বুঝলে?"

নিস্তারিণীদেবীর মনটি ছিল এত কোমল ও সেই অনুপাতে এমন দুর্ব্বল যে, একটু বুঝাইয়া কেহ কোন কথা বলিলেই তাঁহার মনটির মধ্যে তাহা আঁচড় কাটিয়া দিত, মনের মত না হইলেও প্রতিবাদ করিবার মত ভাষা তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না, সেই বক্ষ্যমান কথাগুলিই তাঁহার দুর্ব্বল বক্ষ তোলপাড় করিত ও অবশেষে তিনি তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া বরণ করিয়া লইতেন। এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল তাহাই; স্বামীকে তুষ্ট করিতে

স্বামীর ইচ্ছানুসারে তথাকথিত সকল 'কুসংস্কার' বিসর্জ্জন দিয়াই নূতন-ভাবে তিনি তাঁহার সংসারটি পাতিয়াছিলেন।

একমাত্র কন্যা রেবার তরুণ জীবনের দিনগুলিও এই প্রচণ্ড সভ্যতার আলোক-সম্পাতে অনুরঞ্জিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। কলেজে উচ্চ শিক্ষার সংস্পর্শে, যুবসঙ্ঘের সহিত অবাধ মেলামেশা, উৎসবাদিতে অসঙ্কোচে যোগদান, বিভিন্ন ধনভাণ্ডারের সহায়তা কল্পে কলেজের সংশ্রবে সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার প্রতীকগুলির প্রত্যেকটিতেই রেবার প্রাদুর্ভাব পূর্ণমাত্রায় দেখা যাইত।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুসজ্জিত হলঘরে বসিয়া রেবা যখন তাহার কলেজের তরুণ বন্ধুদের সহিত সাহিত্য রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধে বিতর্কে যোগদান করিত, চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেন আর তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। এই সূত্রে অতুলকুমার রায় ও মহেন্দ্রমোহন উপাধ্যায় এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া পড়ে।

অতুল জমিদারের ছেলে। মানভূম জেলার যে অংশে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভ্রের খাদ, তাহারই সান্নিধ্যে অতুলদের জমিদারী। এই সূত্রে অতুলের পিতা রাজনারায়ণবাবুর সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজনারায়ণবাবুর মৃত্যুর পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভিভাবকের মত অতুল, তাহার বিধবা মাতা ও ভগিনীদের সদা-সর্ব্বদাই খোঁজ খবর লইতেন।

মহেন্দ্রের পিতা অধ্যাপক মদনমোহন উপাধ্যায় এলাহাবাদের কায়স্থ

কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য তিনি বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী—উভয় সমাজের সুধীবৃন্দের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। মিলনের তিনি প্রতীক স্বরূপ ছিলেন বলিয়া উক্ত অঞ্চলে কখন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিস্তার ঘটে নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুরোধে তিনি কলেজের পর তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া রেবাকে পড়াইতেন। এখানেও তিনি নিজের মধুর ব্যবহারে এই পরিবারের সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রেবাকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, অনেক উপদেশও দিতেন। আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে রেবা তর্ক তুলিলে, তাহার আলোচনায় উপাধ্যায় মহাশয় এমন সরলভাবে তাহার ভ্রমগুলি দেখাইয়া দিতেন যে, রেবার মুখে আর প্রতিবাদের মত ভাষা ফুটিত না, উপাধ্যায় মহাশয়ের কথাগুলি তাহার মনের ভিতর মোচড় দিতে থাকিত। ঘটনাচক্রে রেবাকে পড়াইতে পড়াইতে, তাহাদেরই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে সহসা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া উপাধ্যায় মহাশয় ইহজীবনের মত অধ্যাপনা সাঙ্গ করিয়া চির-নিদ্রিত হন। এই সূত্রে উপাধ্যায়পুত্র মহেন্দ্রের উপর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্নেহ-সহানুভূতি পূর্ণ-মাত্রায় পতিত হয়, আর মহেন্দ্রও রেবাদের বাহিরের হল ঘরখানি তাহার পিতার মহিমময় স্মৃতির শেষ প্রতীক মনে করিয়া দিনান্তে অন্ততঃ একবারও আসিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিত না। উপাধ্যায় মহাশয় ধনী না হইলেও তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছলই ছিল এবং অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার কোন বিষয়েই অভাবগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না।

গোটা মানুষ

একমাত্র পুত্র মহেন্দ্র ভিন্ন সংসারে উপাধ্যায় মহাশয়ের আর কোন অবলম্বন ছিল না। পিতার শিক্ষাই মহেন্দ্রকে শিক্ষিত, কর্ত্তব্যে প্রণোদিত এবং দেশসেবায় অবহিত করিয়াছিল। পিতার ইচ্ছাকেই আদেশ মনে করিয়া পিতৃভক্ত পুত্র তদনুসারে সকল কার্য্যে লিপ্ত হইত। মহেন্দ্রের এই অদ্ভুত পিতৃভক্তি সম্বন্ধে তাহার সহপাঠীরা বিদ্রূপাত্মক বক্রোক্তি করিলেও, মহেন্দ্র কোনরূপ প্রতিবাদ করিত না, পিতার আদর্শে সে আপনাকেই শাসন করিতে অভ্যস্ত ছিল।

অতুলই ছিল এই দলের অগ্রণী। সে প্রায়ই মহেন্দ্রের প্রসঙ্গে বলিত—He is the measure of all things. কিন্তু যেদিন ফিজিওলজীর বিখ্যাত অধ্যাপক পালিত সাহেব অতুলের কথাটার উত্তরে বলেন—It is knowing what he is and what he does, that man is distinguished from the brutes. অতুল সেদিন হইতে মহেন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত হয়।

পর পর দুই বন্ধুর বিয়োগের পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পালা আসিয়া উপস্থিত হইল। ধনের খ্যাতি ও ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি পরিপূর্ণভাবে সমাজের উপর বিস্তার করিবার যে কল্পনা তাঁহার ছিল, তাহা পূর্ণ হইতে না হইতেই মহাকালের আহ্বান তাঁহার কানে আসিয়া বাজিল। মহাযাত্রার সময় আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়াই সেই শেষ সময়টিতে তিনি ব্যগ্রভাবে পত্নী নিস্তারিণীকে বলিয়াছিলেন—এখন মনে পড়ছে নিতু, তুলসীতলা, শালগ্রামশিলা; কিন্তু আর ত সময় নেই!

শয্যাপ্রান্তে অনেকেই ছিলেন, মহেন্দ্রও ছিল; সে ছুটিয়া গিয়া কোথা হইতে নারায়ণের চরণামৃত ও তুলসীপাতা আনিয়া সেই পরপারের

যাত্রীর শুষ্ক ওষ্ঠের উপর ধরিতেই তিনি বিস্ফারিত নেত্রে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "দেবদূত—দেবদূত!" পর মুহূর্ত্তে সেই দৃষ্টি রেবার মুখের উপর ফেলিয়া 'নারায়ণ! তুমি সত্য—তুমি সত্য!' এই কয়টি কথার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

*   •   *   •

তাহার পর দুইটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে—চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা কোন বিখ্যাত অ্যাটর্ণী অফিসের তত্ত্বাবধানে এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছিলেন যে, স্ত্রী নিস্তারিণী বা কন্যা রেবাকে সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তিত বা বিচলিত হইতে হয় নাই। জীবনযাত্রা যেমন চলিতেছিল, সেইভাবেই চলিয়া যাইতেছিল। রেবার পড়াশুনা, অতুল ও মহেন্দ্রের সহিত আন্দোলন-আলোচনা কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

দুই

রেবা নিজে ত কলেজ ছাড়িলই না, বরং যে সকল মেয়ে কলেজ ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদিগকেও ছাড়িতে দিল না। কথাটা অতুলের কানে উঠিতে বিলম্ব হইল না, মহেন্দ্রও শুনিল।

অতুল রাগের বশে সেই দিন সত্যাগ্রহী দলে নাম লিখাইল। রেবা শুনিয়া মনে মনে হাসিল।

সেই দিনই অপরাহ্নে মহা আড়ম্বরে অতুল এই সমাচারটি রেবাকে

শুনাইয়া বলিল : আমি প্রেসিডেণ্টকে বলেছি, সব চেয়ে সাংঘাতিক স্থান যেটি, সেইখানেই যেন আমাকে পাঠান হয়। তিনিও রাজী হয়েছেন। 'কল' এলো ব'লে।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল : সেই সাংঘাতিক স্থানটিতে গিয়ে তোমার রোজনামচাটা কি রকম হবে, অতুলবাবু?

অতুল বলিল : তুমিও যে মহেন্দ্রের মত আজগুবি প্রশ্ন ক'রে বসলে রেবা!—উপস্থিত বুদ্ধি যেমন দরকার, তেমনই কথা বলবারও কায়দা চাই। সে ত আর বৈঠকখানা নয় যে, খানা-পিনা, গল্প-গুজব, আমোদ-আহ্লাদের একটা রুটিন থাকবে! সে বড় বিষম ঠাঁই।—ঠিক রণক্ষেত্রের মত ধরাবাঁধা ব্যবস্থা সেখানে। উত্তেজিত 'মনকে' সংযত করা —পুলিসের লাঠির সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়নো—এমন কত কি কাজ সেখানে,—কত বলব?

শুনিতে শুনিতে রেবারও বুকখানি উত্তেজনায় ফুলিয়া উঠিতেছিল,— মনে হইতেছিল, সে-ও বুঝি এক বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত! জনতা ভাঙিবার জন্য শত শত লাঠি উঠিয়াছে, আর সে যেন সেই অসংখ্য উদ্যত লাঠির সম্মুখে তর্জ্জনী তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সকলেই স্তব্ধ, স্তম্ভিত!

পরক্ষণেই অভিভূতের মত সে বলিয়া উঠিল : আমিও সত্যাগ্রহী দলে নাম লেখাব, তারা নেবে আমাকে?

উৎসাহ প্রদীপ্ত মুখে অতুল বলিল : আনন্দের সঙ্গে। তোমার মত শিক্ষিতা মেয়েই ত এরা চায়। যাবে সত্যি, না—কলেজ ছাড়বার মত শেষে আবার পেছিয়ে পড়বে?

এই সময় মহেন্দ্র আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল : আজ আবার কোন্ পর্ব্ব চলেছে ?

অতুল মুখভঙ্গি করিয়া উত্তর দিল : "কর্ণ-পর্ব্ব ।"

উচ্চ হাস্যরবে সুবৃহৎ হলঘরখানি মুখরিত করিয়া মহেন্দ্র বলিল : একেবারে নিছক খাঁটি কথাটি ব'লে ফেলেছ, অতুল !

রেবা মহেন্দ্রের মুখের উপর বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল : এর মানে ?

মহেন্দ্র বলিল : আমাদের দেশের কাজে স্থান-বিশেষে এখন কর্ণ-পর্ব্বই চলেছে ।

অতুল বেশ তিক্ত স্বরেই জিজ্ঞাসা করিল : কেন বল ত ?

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল : তুমি এত বড় অভিনেতা হয়েও কথাটা বুঝলে না ?—কর্ণের কামনা ছিল—পাণ্ডব যদি ধ্বংস হয় ত তাঁর দ্বারাতেই হোক,—আর তা যদি না হয়, পাণ্ডব-ধ্বংসের প্রয়োজন নেই । এই জন্যই কর্ণ ভীষ্মপর্ব্বে অস্ত্র হাতে করেন নি, দ্রোণপর্ব্বে যদিও লড়েছিলেন, কিন্তু সেও আড়-আড় ছাড-ছাড ভাবে, শেষে যা কিছু করবার নিজের পর্ব্বেই করেছিলেন । কর্ণের নজীব এ যুগেও চলেছে । দেশের দুর্ভাগ্য, বেশীর ভাগ দেশভক্ত সুবিধাবাদের এই নীতিটাই বেছে নিয়েছেন ।

অতুল উত্তেজিত হইয়া বলিল : তুমি মিথ্যাবাদী ।

মহেন্দ্র কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল : ধীরে বন্ধু, ধীরে । অত উত্তেজিত হয়ো না । কথার চেয়ে আমি কাজের বেশী পক্ষপাতী, তোমাকে দিয়েই একদিন আমি আমার এই কথাটা প্রমাণ করে দেব ।

অতুল বলিল : যদি না পার ?

হাসিয়া মহেন্দ্র উত্তর দিল : তা হলে না হয় হেরে যাব। কিন্তু উত্তেজনার বশে কোন শপথ বা পণ করতে প্রস্তুত নই, বন্ধু !

অতুল গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল : তুমি আমার সঙ্গে যে রকম খিট-খিট আরম্ভ করেছ, একদিন হাতাহাতি হয়ে যাবে দেখছি।

মহেন্দ্র বলিল : সভায় কথা পড়লে তাই নিয়ে বিচার বা বিতর্ক করে মানুষ। আর তাতে অধৈর্য্য হয়ে হাতাহাতি কামড়াকামড়ি করে—মানুষের অনেক নীচে যে সব জন্তু বিশেষ থাকে—তারাই।

রেবা বলিল : বন্ধুভাবে আমরা এখানে কোনও বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করি, আর সেই প্রসঙ্গে যদি কোন অপ্রিয় কথাও ওঠে, তাতে কি রাগ করা উচিত, অতুলবাবু ? এস, আমরা অন্য কথা আলোচনা করি।

কিন্তু সে দিন আর কোন কথাই তেমন জমিবার অবকাশ পাইল না।

তিন

পরদিন মহেন্দ্র আসিতেই রেবা বলিল : আমি মেয়ে সত্যাগ্রহী দলে যোগ দেব মনে করেছি, মহেন্দ্রবাবু, এতে তোমার আপত্তিটা কি বলত ?

মহেন্দ্র স্থিরদৃষ্টিতে রেবার মুখের দিকে চাহিয়া, পরক্ষণে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল : কথাটা তুলেই সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির কথা জিজ্ঞাসা—এর অর্থ কি, রেবা ?

রেবা অভিমানের সুরে বলিল : তুমি আমার কোন্ কথাটিতে আপত্তি করনি বল ত ? কলেজে থিয়েটার করা, সভায় গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, কলেজে পড়া—সবটিতেই তোমার আপত্তি ! কেন বল ত শুনি ?

মহেন্দ্র বলিল : তুমি যদি কোন বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা কর, তার উত্তর তোমার পক্ষে অপ্রীতিকর হলেও, খোলাখুলিভাবে বলে ফেলাটা আমার পক্ষে কি অন্যায় ? তুমি ইচ্ছা করলে তা না মেনেও পারতে।

রেবা বলিল : কলেজের থিয়েটারে তিনবার 'হ্যাপিয়ার' হয়ে ২১খানা মেডেল পেয়েছিলুম। শেষে তোমার খোঁটায় তাও ছেড়ে দিলুম !

মহেন্দ্র বলিল : না দিলেও পারতে। আমি সেটি অনুচিত মনে করেই বারণ করেছিলুম। কিন্তু তুমি যদি তা না মেনে পুনরায় তাতে যোগ দিতে, আমি ত বাধা দিতে পারতুম না।

রেবা বলিল : এখন যা জিজ্ঞাসা করলুম, তার জবাব দাও, শুনি।

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল : আমার জবাবদিহি ত তোমার মনোমত হবে না রেবা।

রেবা অভিমানভরে বলিল : সে আমি জানি, তবু বল তুমি, আপত্তি তোমার কি আর কেন ?

মহেন্দ্র বলিল : আপত্তি এই জন্য রেবা, যে, তুমি ওর ভেতর গেলেই বিপদে পড়বে—

রেবা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল : তোমার এ আপত্তি ভেসে

গেল মহেন্দ্রবাবু ; বিপদকে ডেকে নেবার জন্যই না ঐ দলে যোগ দিতে যাওয়া ? তবে বিপদে পড়ব, মানে ?

মহেন্দ্র বলিল : মানে এই, তুমি যা মনে ক'রে ওতে যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, গেলেও সেখানে তোমার মনের সে ক্ষুধাটুকু মিটবে না। মন যদি উপবাসী থাকে, তা হ'লেই বিদ্রোহ বেধে যায়। বিদ্রোহ এলেই আসে বিপদ। বাইরের বিপদকে ঠেকান যায়, কিন্তু মন বিদ্রোহী হয়ে ভিতরে ভিতরে যে বিপদ তৈরী করে, তাকে থামানো যায় না। আমি তোমার এই বিপদের কথাই বলছি, রেবা।

এই সময় অতুল আসিয়া মহেন্দ্রের দিকে কটাক্ষ করিয়াই রেবার দিকে চাহিল। রেবা উল্লাসভরে বলিয়া উঠিল : এই যে, অতুলবাবু এসেছ, বসে পড় শীগ্‌গীর, মস্ত তর্ক আরম্ভ হয়েছে।

অতুল একখানি চেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াই বলিল : বাগানে ঢুকেই তার আভাস পেয়েছি, কথাগুলো যে না শুনেছি তাও নয়, কিন্তু ঠিক হজম করতে পারিনি।

রেবা হাসিয়া বলিল : কেন বল ত ?

অতুল বলিল : ঠিক বুঝতে পারছি না, মহেন্দ্রের তথ্যটি কি ! মনস্তত্ত্ব, না জ্যোতিষতত্ত্ব ?

রেবা মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল : শুনছ ত মহেন্দ্রবাবু ?

মহেন্দ্র বলিল : খাঁটি কথার মার নেই, তার সব অর্থ-ই হয়, যে যে ভাবে তার রস গ্রহণ করতে চায়।

রেবা বলিল : আমি যদি তোমার কথাগুলো শুনে এই অর্থ-ই করি যে, তুমি আমার সম্বন্ধে যা বললে, তা জ্যোতিষেরই অন্তর্গত ?

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল : আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। মানুষের মনস্তত্ত্ব জেনে. যা ভেবে বলা যায়, জ্যোতিষও তাই গণনা করে ব'লে দেয়।

রেবা অবাক হইয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল : বল কি ?

অতুল শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল : ভাগ্যগণনাতেও তুমি তা হ'লে ওস্তাদ হয়েছ দেখছি। বাহাদুর ছেলে !

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল : এতে বাহাদুরী কিছুই নেই. আর গণনার ঝঞ্ঝাটও নেই। ইচ্ছে করলে সবাই এরকম বাহাদুর হতে পারে।

রেবা কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল : সে ইচ্ছেটা কি রকম মহেন্দ্রবাবু ?

মহেন্দ্র বলিল : মনে আর কথায় ঐক্য, সত্যনিষ্ঠা, আর—একাগ্রতা।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রেবা বলিল : ওরে বাবা ; একবারে ত্র্যহস্পর্শ যে !

অতুল হাসিয়া বলিল : বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগখানা আবার আজ থেকে পড়তে সুরু ক'রে দাও, রেবা ! যথা—সদা সত্য কথা বলিবে—

রেবা এই কথাটিতে খুব কৌতুক অনুভব করিয়াই উল্লাসভরে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবময় মুখখানিতে তাহার হাস্যোচ্ছ্বসিত দৃষ্টি পড়িতেই অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত হইয়াই যেন সহসা সেই হাস্যধারা সম্বরণ করিয়া বলিল : তা হলে মহেন্দ্রবাবু, তোমার আপত্তির

পায়নি, ভারতের সমাজ ও সংসারের বাস্তব ধারার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, কতকগুলো বেপরোয়া মেয়েকে মাতিয়ে যারা মেয়েদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাধাতে চায়, তারাই আজ স্বামী-সংসারে অধিষ্ঠিতা সর্ব্বে সর্ব্বময়ী নারী জাতির সম্বন্ধে এই সব চণ্ডনীতি প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পৌণে ষোল আনা নারীই এদের এই সব আজগুবি ধারণা শুনে অবাক হ'য়ে যান, কিম্বা মনে মনে হেসেই সারা হন!

রেবা স্তব্ধ হইয়া কথাগুলি সব শুনিল। সর্ব্বাপেক্ষা অতুলের বাড়ীর উপমাটা গভীরভাবে তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল।

অতুল কিছুতে হটিবার পাত্রই নয়,—সে জোর করিয়া বলিল: অর্থের দিক দিয়েই যে নারী আজ সকল রকমে পুরুষের এই অধীনতা মেনে চলেছে, এ কথা তুমি অস্বীকার কর?

মহেন্দ্র বলিল: আমি যদি তোমার এই কথাটিই ঘুরিয়ে বলি, সংসারকে স্বচ্ছল করতে, স্ত্রীপুত্র পরিবারকে সুখী করবার জন্য, নারীর দৈন্য ঘোচাবার জন্য পুরুষই নানাভাবে জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত, এর জন্য উচ্চ কাজ থেকে, নানা নীচ কাজ,—পরের দাসত্ব, উঞ্ছবৃত্তি, চুরি, বাটপাড়ি, জোচ্চুরি—কত কি করছে। তুমি এর উত্তরে কি বলতে চাও?

অতুলকে নিরুত্তর দেখিয়া, পুনরায় সে বলিতে লাগিল: পুরুষ পয়সা উপায় করে—নারীর জন্য, তাকে সকল রকমে সুখী করবার জন্য। এতে পুরুষের কাছে নারীর দাস্য বা অধীনতার কথা আসতেই পারেনা।

অতুল এতক্ষণে ঘামিয়া উঠিয়াছিল। তবুও সে পরাজয় স্বীকার

করিলনা, তবে মনের ঝাঁঝ একটু নরম করিয়া বলিল: তা হলেও মেয়েদের পক্ষে এভাবে জীবনযাপন রীতিমত হীনতা, এর চেয়ে অন্যত্র চাকরী করেও বেঁচে থাকায় বরং গৌরব আছে। পুরুষের 'বোঝা' না হয়ে মেয়েদের নিজের নিজের ভার নিজেদের নেওয়া উচিত। আর, প্রত্যেক মেয়ের মনের কথাটাও এই।

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল: মেয়েদের নাম দিয়ে কোনও কোনও পুরুষ ভীরুর মত আজকাল এই ধরণের প্রবন্ধ কাগজ-বিশেষে লিখে থাকে দেখিছি! আমি এই শ্রেণীর একটা ধড়িবাজকেও জানি। মেয়েদের নাম দিয়ে মেয়েদেরই বিরুদ্ধে এমন অনেক কথাই লেখে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা। তোমার বাড়ীর মা বা ভগিনীরা যেমন এসব কথা শুনলে কানে আঙুল দেন নিশ্চয়, তেমনই আর সব বাড়ীর মেয়েদেরও এই অবস্থা জানবে। তাঁরা স্বামীর সংসারকে পরের সংসার বলে যখন ভাবেন না, তখন খাটুনিটাকেও দাসীপণা বলে মনের কোণেও স্থান দেন না। আর স্বাধীনভাবে চাকরী করে জীবিকার কথা যা বললে, তার প্রতিবাদ করতেও লজ্জা হয়।

অতুল উষ্ণভাবেই জিজ্ঞাসা করিল: কেন?

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল: সংসারের খাটুনিটাকে দাসীবৃত্তিই যদি বল, বাড়ীর মেয়েদের সেই দাসীবৃত্তিটুকুই আশ্রয় করে জীবিকা নির্ব্বাহ করাটা কতখানি কষ্টের, আর পরের বাড়ীতে চাকরী করে স্বাধীন-জীবিকা যাপন করাটা কতখানি গৌরবের—সেটা তুমিই মনে মনে ভেবে দেখ!—রেবা কি বল?

দুইজনের কেহই কিছু বলিল না। রেবার অত উত্তেজনা, অত

রোষ, স্বার্থপর পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে মনের অত বড় বিদ্রোহ—ধীরে ধীরে একেবারে মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে সলজ্জ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, আর অতুল বাম চক্ষুর কটাক্ষে রেবার সেই স্তব্ধ গম্ভীরভাবটুকু দেখিয়া দক্ষিণ চক্ষুর কটাক্ষে মহেন্দ্রকে বিদ্ধ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—ক্ষণিকের জন্যও দেবতার আশীর্ব্বাদে এই কটাক্ষ যদি অগ্নিময় হইয়া উঠে!

মহেন্দ্রও বুঝি মনে মনে ভাবিতেছিল, অহেতুকী জেদের উন্মেষে যেমন জ্বালাময় উচ্ছ্বাস, অবসানেও তেমনই গভীর অবসাদ।

চার

সত্যাগ্রহী দলে নাম লিখাইলেও অতুলের কিন্তু এ পর্য্যন্ত আহ্বান আসিল না। রেবা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত: আমি তাদের বলেই রেখেছি, ছোটখাট ব্যাপারে আমাকে যেন না টানে—বড় ব্যাপার এর মধ্যে তেমন কিছু আসেনি কিনা—

অতুল কিন্তু মনে মনে জানিত, আহ্বান না আসার জন্য, সে কি রকম কল-কৌশল প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছে। পয়সা হাতে থাকিলে, এদেশে সবই সুলভ হয়; ঘরে বসিয়াও দিগ্‌গজ দেশকর্ম্মী হইতে বাধে না!

মহেন্দ্র এ রহস্য জানিয়াও প্রকাশ করে নাই। অন্যের অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় কথা বলিতে কোন দিনই সে অভ্যস্ত

ছিলনা এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি কোনও কথা গোপন করিতে চায়, তাহার কথা ব্যক্ত করাও সে উচিত মনে করিত না।

অতুল দেখিল, সকল বিষয়েই রেবা তাহার একান্ত পক্ষপাতিনী এবং রেবার মতের সহিত তাহার মতের গরমিল না হইলেও, মহেন্দ্রের যুক্তিগুলি অধিকাংশ সময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত তাহাদের এই মিলনের বন্ধন ছেদন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়! সে এবার মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিল যে, মহেন্দ্রকে অন্ততঃ কিছুদিনের মত যদি তফাৎ করা যায়, রেবাকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

রেবা সেদিন কলেজ যায় নাই। অতুল সে খবর রাখিয়াছিল। বাহিরের হল ঘরে বসিয়া রেবা সেদিনের 'লীডার' পড়িতেছে, এমন সময় অতুল ঝড়ের মত ছুটিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে সেইভাবে সহসা আসিতে দেখিয়া ও তাহার মুখ-চক্ষুর অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে চমকিত হইয়া রেবা জিজ্ঞাসা করিল: হয়েছে কি, অতুলবাবু?

অতুল অভিনেতার ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল: আর ত এখানে আসা চলে না, রেবা, তাই আমি ছুটি নিতে এসেছি—

রেবা তাহার কথার মর্ম্ম না বুঝিয়া জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অতুল বলিতে লাগিল: এই ঘরখানিতে তোমার বাবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তাই সময়ে অসময়ে এখানে এসে কথাবার্ত্তায় তৃপ্তি পেতুম। কিন্তু আর আসা চলে না—

রেবা জিজ্ঞাসা করিল: কেন অতুলবাবু? এ কথা বলবার মানে?

অতুল বলিল: মহেন্দ্রের অত্যাচার। সে যদি আমাকে অপমান করত, কিম্বা পথের উপর ধরে দু'ঘা বসিয়ে দিত, আমি তাকে ক্ষমা

করতে পারতুম। কিন্তু সে তোমার বাবার অপমান করেছে—পথে দাঁড়িয়ে—সকলের সামনে।

রেবার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি কালো হইয়া গেল; কিন্তু মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

অতুল তাহার সে ভাব কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ববৎ উচ্ছ্বাসের সুরেই বলিতে লাগিল: যেদিন থেকে তোমার কলেজ ছাড়বার কথা হয়, সেই দিন থেকেই কত লোকের কাছে তোমার সম্বন্ধে কত নিন্দেই না করেছে। তোমার নিন্দা করলেও না হয় সহ্য করা যেত, কিন্তু তোমার বাবার সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছে, শুনলে নিজেকে আর বরদাস্ত করা যায় না—

রেবা বিকৃত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: কি বলেছে?

অতুল বলিল: সে অনেক কথা। তোমার বাবা ছিলেন নাস্তিক, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েই ঠাকুর দেবতাকে কলা দেখালে, সনাতন ধর্ম্মে আস্থা ছিল না—তোমাকে প্রশ্রয় দিয়ে নটি তৈরি করে গেছেন,—এই রকম নানা কথা, আর এসব, যার তার কাছেই বলে বেড়াচ্ছে! এই কাল বিকেলে—কলেজের সামনে প্রফেসর পালিতের কাছেই তোমার কলেজ ছাড়বার কথা তুলে কত কথাই না বললে—তোমার বাবাকে পর্য্যন্ত—সে সব আর কি বলব? পালিত সাহেব ত শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন!

রেবা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে তখন সমুদ্রের তরঙ্গ যেন আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল,—অস্বাভাবিক উত্তেজনায় দুই চক্ষু হইতে বুঝি অগ্নিকণা ফুটি ফুটি করিতেছিল।

অতুল বলিল: আজই তুমি এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেল, রেবা।

আমি কিন্তু মহেন্দ্রের সঙ্গে এ ঘরে আর বসব না, এ তোমাকে আমি বলে রাখছি। আমি সব সহ্য করতে পারি, নিজের অপমানও; কিন্তু তোমার বাবার অপমান আমি কিছুতেই পরিপাক করতে পারব না।

অভিনেতার ন্যায় বিচিত্র ভঙ্গিতে অতুল কথাগুলি বলিয়াই চলিয়া গেল। তাহাকে ডাকিয়া বসাইবার মত অবস্থা তখন রেবার ছিল না।

রেবা অবাক হইয়া মহেন্দ্রের ব্যবহার ভাবিতে লাগিল। সৌম্যমূর্ত্তি স্পষ্টবাদী সাদাসিধা এই মানুষটির ভিতরখানা যে এমন কুৎসিত, তাহা ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর মধ্যে তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও সকলের চেয়ে গর্ব্বও গৌরবের বস্তু তাহার পিতার স্মৃতি। সেই পুণ্যময় স্মৃতির অবমাননাকারী—সে যেই হউক না কেন, কিছুতেই সে তাহাকে ক্ষমা করিবে না। তাহার সম্মুখেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুবৃহৎ তৈলচিত্রখানি ঝুলিতেছিল, অশ্রু-বিস্ফারিত-লোচনে সে সেইদিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল: মহাপ্রস্থানের সময় তুমিও তার দিকে ঐ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলে—'দেবদূত'! আজ তোমার প্রতি তার আচরণ কি অদ্ভুত!

মহেন্দ্র কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই রেবার অস্বাভাবিক আকৃতি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিয়া রেবা দ্বারের দিকে চাহিতেই মহেন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি তাহার চক্ষুর উপর পড়িল; অমনি রেবার মনে হইল—তাহার সর্ব্ব-অঙ্গে যেন জল-বিছুটির জ্বালা ধরিয়াছে!

চেয়ারের হাতলটি হাত বাড়াইয়া ধরিয়াই মহেন্দ্র আর্দ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: তোমার আজ কি হয়েছে রেবা,—বেশ স্বচ্ছন্দ ত দেখছি না?

উদ্বেলিত জ্বালাময় হৃদয়কে সবলে আয়ত্ত করিয়া রেবা বলিয়া উঠিল:

গোটা মানুষ

মহেন্দ্রবাবু, আমার বাবাকে অপমান করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে, আমি তা জানতে চাই—

মহেন্দ্র তখন চেয়ারখানিতে বসিতে যাইতেছিল, তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ ক্ষিপ্রভাবে সোজা হইয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল : কি বললে ?

মুখের কথা তাহার মুখেই রহিয়া গেল, বাহির হইল না। কিন্তু তাহার সেই ভাবপূর্ণ মুখভঙ্গি দেখিয়াও রেবার দয়া হইল না, বা ক্রোধের কিছুমাত্র উপশম হইল না। সে আরও খরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল : ঐ আমার বাবার ছবি ও পাশে তোমারও বাবার ছবি রয়েছে,—ওঁদের দিকে চেয়ে শপথ করে তুমি বলতে পার—কাল কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে প্রফেসর পালিতের কাছে তুমি আমাদের প্রসঙ্গে কথা—

মহেন্দ্র তার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দিল : শপথ করবার ত কোন প্রয়োজন দেখছি না রেবা, সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেই ত পারতে। হাঁ,—আমি স্বীকার করছি, প্রফেসর পালিতের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কথা হয়েছিল—

শ্লেষপূর্ণ তীক্ষ্ণ স্বরে রেবা জিজ্ঞাসা করিল : আর আমার বাবার সম্বন্ধে কোন কথা ?

সেইরূপ সহজ ভাবেই মহেন্দ্র বলিল : হ্যাঁ তাঁর কথাও—

কোনমতে আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া রেবা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অগ্নিদিগ্ধ স্বরে বলিল : তুমি বিশ্বনিন্দুক, বেইমান. যাঁর পায়ের তলায় এসে দাঁড়াবার যোগ্যতাও নেই তোমার—পথে ঘাটে তাঁর কথা নিয়ে—উঃ, তোমার দিকে চাইতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে !

এক নিশ্বাসে এই ভাবে অগ্নিবর্ষণ করিয়াই সে ক্রোধে ক্ষোভে

হাঁফাইতে হাঁফাইতে ভিতরের দিকে ছুটিয়া গেল,—আবার কি ভাবিয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল : আমি অনুরোধ করছি তোমাকে মহেন্দ্র বাবু—আর এ ঘরে এসে তাঁর পুণ্যময় স্মৃতিকে লাঞ্ছিত ক'র না কোনদিন—

এক নিশ্বাসে কথা কয়টি বলিয়াই ঝড়ের মত সে বাহির হইয়া গেল—তখন তাহার পুবস্ত মুখখানা সেই দারুণ উত্তেজনার মধ্যেও শিশির সিক্ত পদ্মের মত টস্ টস্ করিতেছিল!

মহেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল : তাহার পর দেওয়ালে দোদুল্যমান চিত্রপট দুইখানির দিকে অশ্রুময় চক্ষুতে চাহিয়াই, পরক্ষণে কি ভাবিয়া, রেবার টেবিল হইতে কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিল। কম্পিত হস্তে বড় বড় অক্ষরে সে লিখিল—

রেবা, আমার বাবার স্মৃতি-বিজড়িত এই পুণ্যময় স্থানটি থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অকপটেই জানিয়ে যাচ্ছি যে, প্রফেসর পালিত মহাশয়ের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে আমি এমন কোন কথাই বলি নাই, যাতে তোমার বা তোমার স্বর্গীয় পিতার সম্বন্ধে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ ব্যতীত কোনরূপ অসম্মানের আভাস থাকতে পারে। আমার বিশ্বাস, পালিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও আমার কথাটায় সমর্থনই করবেন। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও—

শুভার্থী

"মহেন্দ্র"

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই অতুল হল-ঘরে আসিয়া দেখিল—রেবার টেবিলের উপর মহেন্দ্রের হাতে লেখা চিঠিখানি খোলা ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার উপরে একটা সুদৃশ্য পেপার-ওয়েট।

অতুল তাড়াতাড়ি চিঠিখানি তুলিয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। তাহার মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রভাবে পকেট হইতে নোট বইখানি বাহির করিয়া তাহার মধ্যে চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল।—তাহার পর ধীরে ধীরে সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, রেবার সহিত সেদিন সাক্ষাৎ করিবার কোন চেষ্টাও করিল না।

পাঁচ

পরদিন মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিয়া অতুল সহসা জিজ্ঞাসা করিল: রেবার সঙ্গে তোমার হয়েছে কি হে? সে যে একেবারে রেগে আগুন! ব্যাপার কি?

মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল: কেন, সে তোমাকে কিছু বলে নি?

অতুল বলিল: সে না বললে আমি জানব কি করে বল? তা ছাড়া, তুমি কি একখানা চিঠি লিখে রেখে এসেছিলে, সেইটে দেখিয়ে বললে, আবার সাফাই মানা হয়েছে পালিত মশাইকে! আমি যাব জিজ্ঞাসা করতে তাঁকে, লিখতেও লজ্জা করলে না, 'লায়ার কোথাকার'—বলেই চিঠিখানা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। তোমাকে ত যা তা বললেই, আমাকেও রেহাই দিলে না—

মহেন্দ্র বলিল: তোমার অপরাধ?

গোটা মানুষ

অতুল বলিল: বললে, তোমাদের কাউকে বিশ্বাস নেই,—তুমিও বাইরের লোকের কাছে আমাদের 'কুৎসা ক'রে বেড়াও কিনা কে জানে?

মহেন্দ্র বলিল: থাক, এসব শোনবার আমার কোনও আগ্রহ নেই অতুল, আর আমার বাড়ী বয়ে এখবরটুকু তুমি না দিলেও পারতে। এমন কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়।

অতুল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল: বলছ কি তুমি মহেন্দ্র! এত বড় একটা অন্যায় কথা, তোমার সম্বন্ধে সে—

অতুলকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই মহেন্দ্র হাসিমুখে বলিল: 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?' গীতার এই প্রকৃতি তত্ত্বটাই এতক্ষণ আলোচনা করছিলুম, ভারি সুন্দর! শুনবে? অবশ্য যদি তোমার কাজ না থাকে—

অতুল মুখখানা কিঞ্চিৎ মচকাইয়া বলিল: আমার কাজ আছে, চললুম।

আর সে কোন কথা না বলিয়া মহেন্দ্রের পানে না তাকাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে রেবার বাড়ীতে আসিয়া অতুল রেবাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। এদিনও সে বাহিরের ঘরে বসে নাই। তাহার মনের অবস্থাও স্বচ্ছন্দ ছিল না। অতুল আবার মহেন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলিয়া, সে যে এখন মরিয়া হইয়া যার তার কাছে কি ভাবে তাহার কুৎসা করিতেছে, তাহাই সালঙ্কারে প্রকাশ করিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিল।

গোটা মানুষ

কিন্তু রেবা হাত দুইটি জুড়িয়া বলিল: অতুলবাবু, যা হবার হয়ে গেছে, ও কথা ছেড়ে দাও,—আর তার কথা তুলে আমার যন্ত্রণা বাড়িও না,—তার যা মন চায়, তাই করুক।

অতুল এখন দুই বেলাই আসে, কিন্তু তাহাদের মজলিস আর সে ভাবে জাঁকিয়া উঠে না; নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া অতুল বক্তৃতা করে, কিন্তু রেবা তাহা শুনিতে শুনিতেই উঠিয়া যায়।—অতুল কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে, রেবার উপর পরিপূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিবার যতগুলি অস্ত্র তাহার জানা ছিল, সে একে একে সবগুলিই প্রয়োগ করিতেছিল।

রেবা সেদিন সহসা কংগ্রেস আফিসে গিয়া মহিলা বিভাগে নাম লিখাইয়া আসিল। ক্যাম্পে তখন কাজ বেশী ছিল না, গান্ধী-আরউইনের সন্ধি-সর্ত্ত লইয়া তখন দিল্লীতে বৈঠক বসিয়াছে। সকলের লক্ষ্য এখন সেই দিকে। মহিলা-সঙ্ঘের কর্ত্রী রেবাকে জানাইলেন, কাণপুরের সেবা সঙ্ঘে সম্ভবতঃ মহিলা কর্ম্মীর আবশ্যক আছে, সেখান হইতে খবর আসিলেই তাহাকে জানাইবেন।

অতুল এ সংবাদ পাইয়াই সেদিন সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল।

রেবাকে সেদিন অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখিয়া অতুল সাহস করিয়া অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল, তাহার পিতার আদর্শ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিল। একটু মাথা খাটাইয়া পয়সার বলে তাহারা যে কত কাণ্ডই করিতে পারে—একটি মাসের মধ্যে দেশময় কি প্রকারে নাম জাহির করিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল। তাহার পর পকেট

হইতে নোটবুকখানি বাহির করিয়া,নাম বাজাইবার যে বিচিত্র ব্যবস্থাগুলি টুকিয়া রাখিয়াছিল, রেবাকে সেগুলি সে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

দেশের কাজেও, দেশমাতৃকার সেবার সুযোগেও যে, মানুষ পয়সার বলে, দেশবাসীর সঙ্গে এ ভাবে ছলনা করিতে পারে, তাহা ধারণা করিতেও রেবার মনে কষ্ট হইতেছিল। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে যাহাকে সে হাসিমুখে সাদরে আহ্বান করিয়া বসাইয়াছিল, এখন তাহার সঙ্গ যেন তাহার পক্ষে একান্ত অস্বস্তিকর মনে হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে কোনও বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া, সহসা শারীরিক অসুস্থতার ভান করিয়া সে অতুলকে বিদায় দিল। অতুল চলিয়া গেলে তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এক প্রাণান্তকর দূষিত বাষ্প ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে অপসৃত হইয়া গেল।

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল, টেবিলের উপর। অতুল তাহার নোট বহিখানি ফেলিয়া গিয়াছে। দেখিবা মাত্র তাহার মনে হইতেছিল, যেন একটি কৃষ্ণবর্ণ সর্প কুণ্ডলি পাকাইয়া টেবিলখানা আশ্রয় করিয়া পড়িয়া আছে।

রেবার ইচ্ছা হইল, দরোয়ানকে দিয়া অতুলকে ডাকাইয়া, সে খানি ফেরৎ দেয়। আবার পরক্ষণে কি মনে করিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নোট-বুকখানি তুলিয়া লইয়া সেই স্বার্থপর ভণ্ড দেশভক্তের নোটগুলি পড়িবার জন্য যেমন বইখানি সে খুলিয়াছে,—অমনি তাহার মলাটের খাপ হইতে একখানি ভাঁজ করা চিঠি পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া লইয়া খুলিতেই দেখিল, তাহারই নামাঙ্কিত কাগজে তাহারই নামে চিঠি!

আশ্চর্য্য ত ! নীচে দেখিল, মহেন্দ্রের স্বাক্ষর। এক নিশ্বাসে সে চিঠি-খানি পড়িয়া ফেলিল !

তখন রেবার মনে হইতেছিল, সমস্ত আসবার পত্র লইয়া সেই সুবৃহৎ হলঘরখানি যেন দুলিতেছে !

সেইদিনই রেবা পালিত মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া, মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, যাহা জানিল, তাহাতে বুঝিতে পারিল যে, কত বড় অন্যায় সে মহেন্দ্রের উপর করিয়াছে ! পালিত মহাশয় সমস্ত শুনিয়া রেবাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন : মহেন্দ্র তোমার বাবার কুৎসা করবে আমার কাছে, এ বিশ্বাস করতে তোমার প্রবৃত্তি হয়েছিল, রেবা ? তোমার উচিত ছিল না কি, আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করা ! আমি মহেন্দ্রকেও জানি, আর অতুলকেও জানি। অতুলের সম্বন্ধে যে কোন মন্দ কাজ সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত আমি এমন একটি অভিযোগই শুনিনি, যা কোন রকমে আপত্তিজনক।

বাড়ীতে আসিয়া রেবা এবার শয্যা গ্রহণ করিল। নিস্তারিণী দেবী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও তাহাকে সেদিন জলস্পর্শ করাইতে পারিলেন না।

পরদিন অতুল আসিতেই রেবা কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিল : যেদিন মহেন্দ্রবাবু এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান, তিনি আমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সে চিঠি তোমার নোটবুকের ভেতর ঢুকল কি করে অতুলবাবু ?

অতুল চাহিয়া দেখিল, টেবিলের উপরই তাহার নোটবুক। আর তার পাশেই মহেন্দ্রের সেই চিঠি ! কি সর্ব্বনাশ !—কিন্তু এ প্রশ্নেও সে

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই বলিল : আমি ঘরে এসে দেখি, চিঠিখানা মেঝের উপর পড়ে আছে। কাজেই সেখানা তুলে নোটবুকের ভিতর—

রাগে রেবার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল,—তাহার কথায় বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভাবেই সে বলিল : থামো! আর কৈফিয়ৎ তৈরী করতে হবে না, আমি তোমাকে চিনেছি। কাল মিষ্টার পালিতের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলুম, সবই তাঁর কাছে শুনে এসেছি। তোমাকে নমস্কার! বলিয়াই নোট বহিখানি তুলিয়া সজোরে তাহার মুখের দিকে ছুড়িয়া দিল। মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো বইখানি সবেগে অতুলের ওষ্ঠের উপর পড়িতেই তাহার মুখ দিয়া একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বর শ্বসিয়া বাহির হইল।

রেবার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের নির্ম্মল মনটির উপর যেদিন সে নিষ্ঠুরের মত মিথ্যা অপবাদের খোঁচা দিয়াছিল, সেদিন তাহার মুখের ভাব ইহা অপেক্ষাও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল!

বইখানি তুলিয়া লইয়া ওষ্ঠাধর বাম হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল : আমি স্পষ্ট জানতে চাই রেবা, তোমার মতলবখানা কি?

রেবা বলিল : তুমি নিতান্ত নির্লজ্জ, তাই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে এ প্রশ্ন করছ!

অতুল তাহার সুন্দর মুখখানি সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত করিয়া বলিল : তোমার উপর আমার দাবী আছে, সে কথা কি তুমি অস্বীকার করতে চাও আজ?

মুখে ক্রুর হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক বিদ্যুৎপ্রবাহের মত রেবার ওষ্ঠে প্রকাশ পাইল; সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতকণ্ঠে সে বলিল : না, অস্বীকার করছি না। দাবী আমার ওপর অনেকেরই আছে—দেউড়ীর ঐ কুকুরটার

পর্য্যন্ত! সেও চায়—দিনান্তে অন্তত একটিবার আমি তার পীঠ চাপড়াই। এখন তোমার দাবীটা কোন্ ক্লাসের, নিজের বাড়ীতে গিয়ে সেটা ভেবো, তা হলেই বুঝতে পারবে।—এক নিশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া আর কোন প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই রেবা সবেগে ভিতরে চলিয়া গেল।

রেবার গমনগতির দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাহিয়া অতুল ক্ষণকাল সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

রেবা যদি অতুলের মুখখানি এ সময় দেখিত, তাহা হইলে সে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিত যে, অতুলের সেই সুন্দর কমনীয় মুখখানির উপর কে যেন এক ভয়াবহ মুখোস পরাইয়া দিয়াছে! কি ভীষণ তাহার ভঙ্গি, কি কুৎসিত তাহার দৃষ্টি।

ঘণ্টাখানেক পরে একটু সুস্থ হইয়া রেবা বাহিরের ঘরে আসিয়া যেমন বসিয়াছে, দরোয়ান এক খানি পত্র আনিয়া তাহার হাতে দিল। রেবা লেফাফাখানি খুলিয়াই দেখিতে পাইল, ভিতরে আর একখানি পত্রের উপর ক্ষুদ্র একটুকরা কাগজ পিন দিয়া গাঁথা, তাহাতে লিখা আছে—

রেবা মা,

কাল তোমার সঙ্গে মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কথা হলেও, মহেন্দ্র এখন কোথায়, সেই কথাটিই তোমাকে বলা হয় নি। আজ এই মাত্র মহেন্দ্রের পত্র পেয়েছি। কাণপুরের কাছে কোহেলা অঞ্চলে একটা প্রসেশন নিয়ে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে। মহেন্দ্র

হিন্দু মহাসভার সংস্রবে সেখানে গিয়ে কাজ করছে। চিঠিখানা সেখান থেকেই পাঠিয়েছে। তার মুলপত্রখানি এই সঙ্গেই পাঠাচ্ছি।

—অধ্যাপক পালিত

রেবার দুইচক্ষু যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তাহার বুকের ভিতর এত দ্রুত স্পন্দন উঠিতেছিল, সে বুঝি তাহার প্রতি শব্দটিই শুনিতে পাইতেছিল। কম্পিত হস্তে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

স্যর!

এখানে এসে গণদেবতাদের সেবায় যোগদান ক'রে বড় তৃপ্তি পেয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরেও যে গণদেবতাদের সাহচর্য্যে শিক্ষা-লাভের অনেক বিষয়ই রয়েছে, তা আগে জানা ছিল না।

প্রসঙ্গ ক্রমে আজ আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, অজানিত ভাবে এক অপবাদের মুষল আমার মর্ম্মে বিদ্ধ হয়ে আছে। হয় ত অজ্ঞাতে নষ্ট-চন্দ্র দর্শন করেছিলুম! এর প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এই অজ্ঞাতবাস এবং সেই সূত্রে সেবানুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ।

আমাদের সঙ্ঘ শীঘ্রই কাণপুরে যাবে, সেখানে পঁহুছে আবার পত্র লিখব।

—স্নেহধন্য মহেন্দ্র

চিঠিখানি পড়িবার সময়, প্রতি ছত্রের প্রত্যেক অক্ষরটি মহেন্দ্রের সেই ম্লান মুখখানির মত—রেবার অশ্রু-উচ্ছ্বসিত-চক্ষুদুটির উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল। বার বার—তিন বার সে চিঠিখানি পড়িল, পড়িতে পড়িতে দুই চক্ষুর অশ্রুধারায় তাহা ভিজিয়া গেল, দুই হাতে সেই

চিঠিখানি তাহার অনুতাপবিদ্ধ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া টেবিলে মুখ গুঁজিয়া রেবা আজ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণের ফলে চিত্তের সেই আবেগময়ী ভাবটি একটু লঘু হইতেই, রেবা আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিল; রুদ্ধ বেদনাবেগে তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি অপরাহ্নের স্থল পদ্মের মত রক্তিমাময় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া, তাহার পিতার চিত্রপটের দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল: তোমার দেবদূতকে আমি দানবীর মত দেশান্তরিত করেছি, বাবা!

আবার প্রবল অশ্রুবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

ছয়

বিষের মত রেবা অতুলকে পরিহার করিলেও, অতুল তাহার সকল সংবাদই রাখিতেছিল। আভিজাত্যের সম্ভ্রম, অর্থের প্রাচুর্য্য ও কমনীয় আকৃতির সহায়তায় স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে অতুলের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তাহার এই বাহ্য মনোরম আকৃতির অভ্যন্তরে কি কুৎসিত ও কদর্য্য প্রকৃতি আত্মগোপন করিয়া থাকিত, সে দিন রেবাই প্রথম তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। অতুলও সে দিন হইতেই স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, রেবা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে আর তাহার কোন আশাই নাই। এখন এই অনুতাপই তাহার মনে জাগিতেছিল,

যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কেন সে রেবার উপর তাহার দাবী প্রতিষ্ঠা রাখিবার উপায় তখন করে নাই,—কেন আগেই সে সচেষ্ট হয় নাই! ইহার অনুকূলে কত সুযোগই ত আসিয়াছিল! কেন সে মূঢ়ের মত অধিকতর সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছিল! কিন্তু এই অনুতাপ তাহাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিল না। সময়ে সুযোগ থাকিতেও যাহাতে সে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত ছিল, এখন অসময়েই—তাহার সংস্পর্শের বাহিরে আসিয়াও সেই কুণ্ঠাকে অনায়াসে এড়াইয়া সে অন্ততঃ রেবার উপর এমন একটা কিছু প্রতিশোধ লইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল, যাহাতে সমাজে রেবার মুখ দেখাইবার আর কোনও উপায় পর্য্যন্ত না থাকে।—সে নিজে যখন রেবাকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছে, তখন রেবার ভবিষ্যৎ ব্যর্থ বা কলঙ্ককালিমালিপ্ত হওয়াই উচিত!—দেশের জন্য আত্মোৎসর্গপরায়ণ, দেশের নারীজাতির দুর্দ্দশা-দর্শন-কাতর, দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তান অতুলকুমারের ভাবময় অন্তর এই ভাবেই বিভোর হইয়া উপযুক্ত সুযোগের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে নিস্তারিণী দেবীকে বুঝাইয়া, স্থানীয় সেবা-সঙ্ঘের কর্ম্ম-কর্ত্রীর মনোনয়ন পত্র লইয়া, রেবা একদিন সত্যসত্যই কাণপুরের সুভদ্রা সেবাশ্রমে উপস্থিত হইল। শ্রীমতী পার্ব্বতী ভার্গব নাম্নী এক মনস্বিনী মহিলা সনাতন পন্থায় এই প্রসিদ্ধ সেবাশ্রমটি পরিচালনা করিতেছিলেন। রেবা আশ্রমের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একটি প্রৌঢ়া মহিলা নিপুণভাবে বিস্তীর্ণ অঙ্গনটি সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করিতেছে। রেবার পশ্চাতে একজন কুলী তাহার সুট-কেস্ ও বিছানা লইয়া আসিতেছিল।

গোটা মানুষ

রেবাকে দেখিয়াই মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিল: তুমি আসছ কোথা থেকে, বাছা?

রেবা বলিল: এলাহাবাদ থেকে। শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর আফিস কোন ঘরে?

মহিলাটি হাসিয়া উত্তর দিলেন: তোমার নাম রেবা চক্রবর্ত্তী? শ্রীমতী জ্যোৎস্না তোমাকে পাঠিয়েছেন ত?

রেবা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে মহিলাটির দিকে তাকাইল, তাহার মনে বিস্ময়োদ্রেকের কারণ এই যে, একটা সামান্য পরিচারিকা, সেও এত খবর এখানে রাখে!

রেবার বিস্মিত ভাব দেখিয়া তিনি বলিলেন: আমারই নাম পার্ব্বতী ভার্গব।

সবলে বিস্ময়ের ভাব কাটাইয়া রেবা সশ্রদ্ধায় পার্ব্বতী দেবীকে নমস্কার করিল।

যে উৎসাহ, যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া রেবা সেবাশ্রমে কাজ করিতে আসিয়াছিল, একটি দিনেই তাহার সে উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িল, আকাঙ্ক্ষা দূরে চলিয়া গেল। একটা ঘরে দশ বারোটি বিভিন্ন বয়সের মহিলার সহিত তাহাকে রাত্রিবাস করিতে হইল, আভিজাত্যের অভিমান তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেও নীরবেই তাহাকে সাধারণের সহিত রাত্রি কাটাইতে হইল। আহারের ব্যবস্থাটিও যতদূর সম্ভব সাধারণ ও মোটামুটি রকমের; জলখাবার—ভিজা ছোলা আর এক ডেলা আখের গুড়! বাড়ীর রাজভোগের কথা মনে পড়িল, নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্যেও তাহার রুচি আসিত না।

গোটা মানুষ

সর্ব্বাধিক বিস্ময়াপন্ন হইল সে, জলযোগের পর যখন পার্ব্বতী দেবী আসিয়া তাহাকে বলিলেন : রেবা, এবার তোমার কাজ আরম্ভ কর,—বালতি ক'রে জল নিয়ে ঘর দালানগুলো সব ধুয়ে ফেল।

রেবা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। একি পরিহাস না পরীক্ষা?—পার্ব্বতী দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া সে গাঢ় স্বরে বলিল : ওঁরা ত সব বাইরে কাজ করতে চলে গেলেন,—আমাকেও অনুগ্রহ ক'রে বাইরে বেরুতে দিন—

পার্ব্বতী দেবী রেবার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন : ঘরের কাজে আগে তোমার পারদর্শিতা দেখি, তারপর বাইরের কাজের ভার দেব বৈ কি।

রেবা একটু অসহিষ্ণুতার সহিত বলিল : ক্ষমা করবেন, আমার ধারণা ছিল—আমার শিক্ষার অনুরূপ কোনও উচ্চ শ্রেণীর কাজেই যোগ দেবার অধিকার আমি এখানে পাব—

পার্ব্বতী দেবী স্বাভাবিক গম্ভীর ভাবেই প্রশ্ন করিলেন : তোমার মতে উচ্চশ্রেণীর কাজটা কি শুনি?

রেবা একটু সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে বলিল : I say—এই দোকানের সামনে স্পীচ দেওয়া, পিকেটিং করা, সেবা শুশ্রূষার ভার নেওয়া—

পার্ব্বতী দেবী বলিলেন : স্পীচ দেবার বা পিকেটিং করবার আবশ্যক এখন ত নেই, কংগ্রেস-হাসপাতালে কাজ বেশী পড়লে, সেবা-শুশ্রূষা করতে এরা ত যায়ই—তোমাকেও আবশ্যক পড়লে হয় ত যেতে হবে; এখন এদের কাজ কি শুনবে? এক একটা মহল্লা নির্দ্দিষ্ট আছে, এরা

যে-যার মহল্লার বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের চরকা চালানো শেখায়, তুলো দেয়, সেই তুলোয় তৈরী সুতো নিয়ে আসে. তাতে কত কি তৈরী হয়। তোমাকেও ক্রমে ক্রমে এ সব শেখানো হবে। কিন্তু তা-ব'লে ঘরের কাজ ত ফেলে রাখলে চলবে না। আর—শিক্ষার কথা যদি বল, তুমি ত এখনও আই, এ, পাশ করনি, কিন্তু আমি এম, এ, পাশ করেও, ঝাড়ু ধরতে লজ্জা পাই না—তা'ত এসেই দেখেছ। যাও, আর দেরী ক'রনা, কুয়াতলায় বালতি আছে, তাতে জল ভ'রে বেশ করে আগাগোড়া সব ধুয়ে ফেল, আমাকে রান্নার ব্যবস্থা করতে যেতে হচ্ছে।

কাজের নির্দ্দেশগুলি দিয়াই পার্ব্বতী দেবী দ্রুতপদে পাকশালায় গেলেন। রেবা ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বিস্তীর্ণ অঙ্গনে নামিল। বড় বড় দুইটি বালতি সেখানে ছিল। কুয়ার জলে তাহাকে ভরিতে হইবে, আর—

রেবার অন্তর আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে পার্ব্বতী দেবীকে ডাকিয়া বলিল: বালতিগুলো তুলে দেবার জন্যে একটা চাকর পাওয়া যাবে?

পার্ব্বতী দেবী উত্তর দিলেন: সেবাশ্রমে সবাই সেবিকা,—চাকর-বাকর এখানে নেই, অভ্যাস কর রেবা,—অভ্যাস কর, আজ যা কষ্ট বলে মনে হচ্ছে, কাল তা সহজ হয়ে যাবে—

রন্ধনশালায় বসিয়াই তিনি দিব্য গম্ভীরভাবে এই আদেশ দিলেন। মুখখানি ম্লান করিয়া রেবা আবার কুয়াতলায় ফিরিয়া আসিল। জল ভরিতে ভরিতে রেবার মনে তখন মহেন্দ্রের কথা জাগিল,—সে কি তবে এই বিপদের কথাই বলিয়াছিল? সত্যই ত, এমন বিপদের আবর্ত্তে সে

ত আর কখনও পড়ে নাই! অথচ, এখন ফিরিবারও উপায় নাই, ফিরিলে, সে কি আর এলাহাবাদে মুখ দেখাইতে পারিবে? তা ছাড়া যে উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহার?

রেবা দুই হাতে অতি কষ্টে জলপূর্ণ একটি বালতি লইয়া সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দালানে ঢালিয়া দিল, তাহার পর ঝাড়ু দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার বালতি লইয়া উঠিবার সময়, সিঁড়ির উপর একখানি পা হঠাৎ পিছলাইয়া যাইতে, সঙ্গে সঙ্গে হাতের বালতিটীর সহিত রেবা সিঁড়ির নিম্নে ঝুঁকিয়া পড়িল।

এই সময় একটী যুবা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আশ্রমের অঙ্গন অতিক্রম করিয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিল। সে এক লম্ফে আসিয়া পতনোন্মুখী রেবাকে ধরিয়া ফেলিল;—সঙ্গে সঙ্গে ভয়-বিহ্বল-ভাবে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়াই রেবা শুষ্ক হইয়া গেল। তাহার পাণ্ডুর মুখখানির উপর কে যেন এক নিমেষে এক পোঁছ কালি ঢালিয়া দিল—আয়ত দুই চক্ষুর পাতাগুলি যেন কোন্ অদৃশ্য হস্ত জোর করিয়া টানিয়া রাখিতেছিল।

মহেন্দ্র রেবার মুখের দিকে চাহিয়াই গাঢ় স্বরে বলিল: রেবা, —তুমি!

রেবা মুখখানি নত করিয়া দাঁড়াইল, কোন উত্তর দিল না। বা কি ভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে সে সম্ভাষণ আরম্ভ করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না।

মহেন্দ্র তাহার ভাব-ভঙ্গির দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া বা

গোটা মানুষ

তাহার এখানে উপস্থিতি-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলিয়াই সহসা বলিল : আমি বিশেষ প্রয়োজনেই এখানে এসেছিলুম, একটি ছেলেকে নিয়ে আমরা আজ ভারি মুস্কিলে পড়েছি, রেবা, যে কোন মুহূর্ত্তে তার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে,—বিকারের ঝোঁকে সে কেবল তার মাকে খুঁজছে—

রেবা মুখখানি তুলিয়া আবার জোর করিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

মহেন্দ্র বলিল : তুমি সেবাশ্রমে এসেছ, তাই ব'লতে সাহস পাচ্ছি। কলেজে ত অনেক অভিনয় করেছো,—আজ এখানে একটা ভূমিকার অভিনয় করবে রেবা?

সকল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সহসা মহেন্দ্রের মুখের এই প্রশ্ন রেবার বুভুক্ষু মনের উপর যেন বিষ ঢালিয়া দিল। অভিমানে, অপমানে, রাগে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র রেবাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল : সেই ছেলেটির মা হয়ে তোমাকে দেখা দিতে হবে,—সান্ত্বনা দিতে হবে তাকে,—এই জন্যই আমি পার্ব্বতী দেবীর কাছে এসেছিলুম। কিন্তু তোমাকে যে দেখতে পাব, তা ত ভাবি নি—

রেবা আর সহ্য করিতে পারিল না,—তাহার আত্মসম্বরণের অক্ষমতা তাহাকে দুর্জ্জয় অভিমানের উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। অসঙ্কোচে সে মহেন্দ্রের মুখের উপর জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিল : কলেজে কবে কি করেছি, তার খোঁটা দিয়ে, তুমি এমনি ক'রে আমায় অপমান করতে চাও? তুমি কি মনে করেছ, মহেন্দ্রবাবু, আমি

পাবলিক থিয়েটারের নটী,—যে, যার তার কাছে আমাকে অভিনয় করতে—

মহেন্দ্র নিজেকে নিতান্ত অপরাধী মনে করিয়া অপ্রতিভ ভাবে রেবার মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল: আমাকে ক্ষমা কর রেবা, ছেলেটির অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে, আমি হয় ত অন্যায় অনুরোধ করেছি—

সঙ্গে সঙ্গে সে ঝড়ের মত ভিতরে চলিয়া গেল। রেবা সেইখানে দাড়াইয়া অভিমানে ফুলিতে লাগিল,—যাহার জন্য সে কত কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে, আজ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে এখানে পাইয়াও, আবার তাহাকে কত দূরে সরাইয়া দিল।

বাল্তিটি তুলিয়া কুয়াতলায় গিয়া দাড়াইতেই রেবা দেখিল, মহেন্দ্রের সহিত পার্ব্বতী দেবী ব্যস্তভাবে অঙ্গন অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে যাইতেছেন। নিস্পলক নয়নে সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সাত

পার্ব্বতী দেবীর মুখেই রেবা যখন শুনিল,—তিনিই সেই মুমূর্ষু বালকটির মা হইয়া তাহাকে প্রবোধ দিয়া আসিয়াছেন, ফলে বিকারের ভয়াবহ অবস্থা তাহার কাটিয়া গিয়াছে, তখন রেবার শূন্য বুকখানির মধ্যে যেন ব্যর্থতার একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল।

গোটা মানুষ

ভোজনের পর সেবাশ্রমের মেয়েদের সম্মুখেই এই আলোচনা চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় মহেন্দ্রের নাম আসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী দেবী মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিলেন, মেয়েরা সকলেই তাহা সমর্থন করিয়া বলিল: ছেলেটি সব বিষয়েই অসাধারণ, এমন কাজ নেই—যা তিনি জানেন না; হাজারের ভিতর এমন ছেলে একটি মেলে কিনা সন্দেহ!

মহেন্দ্রের প্রশংসায় রেবার মুখ যেমন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের ভিতরটিতেও তেমনিই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। আজ সে ইহাদের কাছেই মহেন্দ্রের প্রশংসা শুনিতেছে, একটি কথাও সে সম্বন্ধে বলিবার সাহস তাহার নাই! তাহার মনে হইতেছিল, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলে, মহেন্দ্রের জীবনের সমস্ত কথা, তাহার মহত্ত্ব, তাহার ত্যাগ, আর মহেন্দ্রের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহার!

কিন্তু আজ সে মূক,—তাহার বলিবার যে আজ কিছুই নাই!

সপ্তাহ মধ্যেই রেবা পার্ব্বতী দেবীর তত্ত্বাবধানে ঘরের কাজ-কর্ম্মে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। অবসরকালে সকলকেই চরকা চালাইয়া সুতা কাটিতে হইত, রেবা প্রথম দুই একদিনের চেষ্টাতেই, এ বিষয়ে সকলের অপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইয়া দিল। পার্ব্বতী দেবী তাহার তৎপরতা দেখিয়া একদিন বলিলেন: তোমার কোন দোষ নেই রেবা, অধিকাংশ মেয়েই উত্তেজনার ঝোঁকে দেশের কাজ করতে আসে। তারা চায়, ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বাইরের ঝঞ্ঝাটে এগিয়ে গিয়ে বাহবা নেবে। কিন্তু এটা তারা বোঝে না, তাদের করবার মত কাজ

ঘরের মধ্যেই রয়েছে, যার জন্য তারা ঘরে বসেই সুখ্যাতি পেতে পারে, আর তাতে সত্যিকারেরই দেশের কাজ করা হয়। ছেলেরা যদি বাইরে কাজ করে, আর মেয়েরা তাদের কাজ করবার শক্তি যদি ঘর থেকে যুগিয়ে দেয়, কত উপকার হয় বল দেখি! যখন জোর পিকেটিং চলত, তুমি দেখনি, এই সেবাশ্রমের মেয়েরা তাতে যোগ না দিয়েও, এই আশ্রম থেকেই ছেলে-পিকেটারদের কত সাহায্য করেছিল। এখনও ত দেখছ, এরা এখানে কত কাজ করছে।

পার্ব্বতী দেবী দেখিলেন, রেবার মাথা নত হইয়া পড়িতেছে। তিনি বলিয়া চলিলেন: তুমি রেবা, একটু লেখা-পড়া ছাড়া, কোন কাজই শেখনি বা শেখা আবশ্যক মনে করনি। কিন্তু দেখছ ত, এখানে এসে সাতদিনের মধ্যেই তুমি কত কাজ শিখে ফেলেছ। তোমার মনে স্বাভাবিক শক্তি আছে প্রচুর, সেই শক্তি বুঝে প্রয়োগ করতে শিখলে, তুমি যথার্থ-ই দেশের কাজ করতে পারবে।

একদিন অপরাহ্নে রেবা উপরের একখানি ঘরে বসিয়া প্রকাণ্ড একটি চরকীর সাহায্যে খদ্দরের সূতায় নলি ভরিতেছিল। আশ্রমের মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তৈয়ারী সূতা আনিতে গিয়াছে, পার্ব্বতী দেবী পাকশালায় বসিয়া মসলা পিষিতেছিলেন।

হঠাৎ চরকার গুরু গম্ভীর আওয়াজকে চাপা দিয়া রেবার পশ্চাৎ হইতে হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠের ঝঙ্কার উঠিল,—হ্যাল্লো।

রেবা চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়াই দেখিল, অতুল অভিনেতার ভঙ্গিতে ঘরের দ্বারটির উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই চক্ষুর

ব্যঙ্গভরা চপল দৃষ্টি রেবার চক্ষুর উপর পড়িতে সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মুখখানি নত করিল, একটি কথাও কহিল না।

অতুল নির্লজ্জের মত হাসিয়া বলিল: এখনও রাগ তোমার যায় নি দেখছি। তুমি আমাকে যতই পরিহার করবার চেষ্টা কর না কেন, আমি তোমার অনুসরণ না করে থাকতে পারিনি, রেবা।

রেবার মুখখানি উত্তেজনায় আরক্ত হইয়া উঠিলেও, স্থান কাল বিবেচনা করিয়াই সে তাহা দমন করিয়া শ্লেষভরে বলিল: এই সাধু উদ্দেশ্যটুকু নিয়েই বুঝি কাণপুরে শুভাগমন হয়েছে?

অতুল রেবার আরক্তিম মুখখানির উপর একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিল: উদ্দেশ্য ত্রিবিধ,—এখানে কিছু বিষয় সম্পত্তি আমার আছে, এই সেবাশ্রমটির ওয়ার্কিং কমিটীর মেম্বর আমি, আর ঘটনা চক্রে এই আশ্রমেই এসে নাম লিখিয়েছ তুমি, এক সঙ্গে তিনটির পরিচর্য্যা —বুঝেছ?

রেবা একটু রূঢ় হইয়া উত্তর দিল: বুঝেছি, আর, কালই যে আশ্রম থেকে নামটা কাটিয়ে আমাকে এলাহাবাদে ফিরে যেতে হবে, তাও স্থির করে ফেলেছি।

অতুল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল: তার ত কোন প্রয়োজন নেই রেবা! আমি এখানে এসেছি কেন শুনবে? পার্ব্বতী দেবীকে ব'লে কোন উঁচুদরের কাজে তোমাকে নিয়োজিত করতে—

বিকৃত ভাবে হাসিয়া রেবা উত্তর দিল: ধন্যবাদ! তোমার এই অযাচিত অনুগ্রহের পরিচয় পেয়ে বাধিত হলুম! এখন দয়া করে কাজ করতে দেবে কি, না পার্ব্বতী দেবীকে ডাকতে হবে আমাকে?

অতুল মনে মনে রোষে জ্বলিয়া উঠিলেও মুখে বেদনার ভাব প্রকাশ করিয়া বিগলিত স্বরে বলিল : এখনও তুমি আমার প্রতি এত অকরুণ রেবা? সত্যই কি আমার কোন আশাই নেই!

রেবা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পরিপূর্ণ শক্তিতে চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই রাস্তার দিকে একটা গোলমাল উঠিয়াছিল, আশ্রমের ভিতরে তাহার সম্বন্ধে প্রথমে কিছুই আভাষ পাওয়া যায় নাই। সেই গোলমালের শব্দ উচ্চ ও স্পষ্ট হইয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছিল। অতুল আশ্রমে আসিবার সময় পথেই শুনিয়াছিল, ভগৎ সিংহের ফাঁসী উপলক্ষে হাঙ্গামা বাধিয়াছে, কাজেই গোলমাল শুনিয়া সে রেবার দিকে মনোযোগ না দিয়া বাহিরের দিকে উৎকর্ণ হইয়াছিল। রেবা কিছুই শুনে নাই, সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহার মনের যত কিছু উত্তেজনা চরকার উপরই প্রয়োগ করিয়াছিল।

বাহিরের দোকানের লোকজন গুণ্ডাদের আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আশ্রমের ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু উন্মত্ত গুণ্ডার দল অল্প চেষ্টাতেই ফটক ভাঙ্গিয়া জয়ধ্বনি সহকারে আশ্রমের ভিতর ঢুকিয়া নিরস্ত্র আশ্রমীদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করিল; তখন রেবার চরকার ঘর্ঘর আওয়াজ মথিত করিয়া বিপ্লবের ভয়াবহ কোলাহল আশ্রম মুখর করিয়া তুলিয়াছে। বিস্ময়াতঙ্কে চরকা ফেলিয়া রেবা ঘরের গবাক্ষ দিয়া অঙ্গনের দিকে চাহিতেই যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে আতঙ্কে অভিভূত হইয়া সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

আশ্রমের অঙ্গন ও চারি ধারের দরদালান ব্যাপিয়া তখন গুণ্ডাদের

গোটা মানুষ

উল্লাসভরা চীৎকারের সহিত লাঠী বাজি চলিতেছিল। নিরীহ নিরস্ত্রগণ—যাহারা আশ্রমের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের আর্ত্তনাদ, প্রাণ ভিক্ষার প্রার্থনা, পলায়ন প্রয়াস, সমস্ত পদ দলিত করিয়া, প্রায় পঁচিশ জন লাঠীধারী গুণ্ডা তাহাদের উপর পিশাচের মত লাঠী চালাইতেছিল, চারিধারের চাতাল দিয়া হোলি-উৎসবের আবির ধারার মত সেই নির্য্যাতিত হতভাগ্যদের রক্তের স্রোত ছুটিয়াছিল। পার্ব্বতী দেবী অবস্থা বুঝিয়া, অকুতোভয়ে গুণ্ডাদিগের সম্মুখে, সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া তাহাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন, উর্দ্দুতে বুঝাইয়া আর্ত্তস্বরে তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার উত্তরে পশ্চাদ্দিক হইতে একজন গুণ্ডা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার উদ্যত বাহুমূলে ছোরা বসাইয়া দিল। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে লাঠিও দুইচারি ঘা পড়িল। উত্তেজিত গুণ্ডার দল তখন বিজয়োল্লাসে আশ্রমের ভিতর ঢুকিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

উপরের ঘরের গবাক্ষ হইতে রেবা এই সব দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অতুলও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, সে ঠিক এই সময় ব্যস্তভাবে ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। পরক্ষণেই কয়েকজন গুণ্ডা হল্লা তুলিয়া সেই দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রেবা বায়ু চালিত লতাটীর মত চরকার পিছনে গিয়া বসিয়া পড়িল।

দরজার উপর দুই একটি আঘাত পড়িতেই, অতুল গবাক্ষের গরাদের উপর মুখ রাখিয়া বলিল: আমি তোমাদের মেহেরবাণীর উপর ভরসা করে দরজা খুলে দিচ্ছি।

দরজা খুলিতেই গুণ্ডারা হল্লা করিয়া উঠিল। অতুল তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে তাহার মণিব্যাগটি বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া অভিনয় ভঙ্গীতে বলিল : নোটে আর নগদে এতে দেড়হাজার টাকারও বেশী আছে, এ সমস্তই তোমাদের দিচ্ছি, এই সর্তে—আমাকে আর আমার স্ত্রীকে তোমরা নিরাপদে আমার আস্তানায় পৌঁছে দেবে।—সেখানে গিয়ে আরও এতগুলি টাকা তোমাদের দেব।

অগ্নির লেলিহান শিখার উপর সহসা কতকগুলি কাঁচা পল্লব ফেলিয়া দিলে, ক্ষণিকের জন্য তাহার শিখা যেমন স্তিমিত হইয়া যায়,—গুণ্ডাদের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল। মাতব্বর-গোছের কয়েকজন একটু তফাতে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, একজন ততক্ষণে মণিব্যাগটি টানিয়া হস্তগত করিয়া তাহার গর্ভজাত বস্তুগুলির সংখ্যা বিচারে মনোযোগ দিল। আর রেবা, অতুলের কথায়, সেই আসন্ন ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও, আর একটা সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির কল্পনা করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

পরামর্শের পর গুণ্ডা-দলপতি অতুলকে জিজ্ঞাসা করিল : তোমার বাড়ী কোন মহল্লায় ?

অতুল বলিল : মলে।

গুণ্ডা মাথা নাড়িয়া বলিল : ওদিকে আমরা যাব না। পাশেই আমাদের হুদো—কর্নেলগঞ্জ, তোমার বিবিকে নিয়ে সেথায় চল,—কিছু ডর তোমার থাকবে না, বাঙ্গালীবাবু। খানাপিনার কোন তগ্‌লীফ হবে না। কিন্তু পাঁচটি হাজার চাই,—দিয়ে তবে ছাড়ান দেব।

অতুল বলিল : বেশ, তাতেই আমি রাজী।

গোটা মানুষ

দলের একজন টাকাটা প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটু সংশয় প্রকাশ করিতেই, দলপতি হাসিয়া বলিল : আরে বেকুব, যার পকেটে হাজার-দেড়হাজার থাকে, তার কাছে পাঁচহাজার আবার টাকা! বাবু সাহেবকে খুসী করতে পারলে—পান খেতেও বাবু সাহেব কোন্ না কিছু দেবে।

পকেট হইতে চেক-বহি বাহির করিয়া অতুল বলিল : টাকার জন্যে তোমরা কোনও সন্দেহ ক'র না : আমি বাসায় গিয়েই চেক লিখে দেব, তোমরা টাকা ভাঙ্গিয়ে আনবে, তার পর না হয় ছেড়ে দেবে—

দলপতি হাসিয়া বলিল : আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব হয়ে যাবে, বাঙ্গালী লোকের দিল কত দরাজ, তা হামি লোকের জানা আছে, তোমার বিবিকে লিয়ে এস, কুছপরোয়া নেই বাবুজী!

অতুল রেবার দিকে চাহিতেই, সে অস্বাভাবিক ভাবে খাড়া হইয়া উঠিয়া দৃপ্ত স্বরে বলিল : যাব না আমি, তার চেয়ে মরবো এইখানে—

বাহির হইতে গুণ্ডা দলপতি বলিল : ডর কিছু নেই বিবি সাহেব—খোদার কসম, তোমার পানে কেউ বদ-নজরটিও দেবে না—

অতুল হাসিয়া বলিল : হঠাৎ এই সব রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে আমার বিবিসাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

রেবা তখন অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অতুল সহসা তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল : চলো!

নিম্নের ঘরগুলিতে তখনও লুণ্ঠন কার্য্য চলিতেছিল—আশ্রমে সঞ্চিত বস্তা বস্তা চাল, ডাল, আলু, গুড় প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী,—যাবতীয়

তৈজসপত্র, খদ্দরের রাশীকৃত কাপড়, পেঁটরা বাক্স—সমস্তই লুঠ হইতেছিল—লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত অঙ্গনের একাংশ পূর্ণ করিয়াছিল, চাতালটির উপর আট দশ জন তখন মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়াছিল, পার্ব্বতী দেবী রক্তাপ্লুত-দেহে সোপান শ্রেণীর নিম্নে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। আহত মুমূর্ষুদের দেহগুলি পদদলিত করিয়া হৃদয়হীন পাষণ্ডগণ পরমোৎসাহে লুঠের মালপত্র অঙ্গনে আনিয়া ফেলিতেছিল। যাহারা ফটকের সম্মুখে এ পর্য্যন্ত পাহারা দিতে ছিল, তাহারাও এ-অবস্থায় লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ফটকের দুই ধারের দোকানগুলির দ্রব্যজাত লুণ্ঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

লুণ্ঠন-পর্ব্বের এই সন্ধিক্ষণে, বেপরোয়া ভাবে গুণ্ডার দল যখন লুণ্ঠিত মালপত্র বহিতে ব্যস্ত,—ঠিক এই সময়ে একদল যুবক এমন সন্তর্পণে ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় সুভদ্রা আশ্রমকে পরিবেষ্টন করিয়া অতর্কিতভাবে অঙ্গনের মহড়াগুলি আগুলিয়া দাঁড়াইল যে, লুণ্ঠনোদ্যত দস্যুদল তাহাদিগকে দেখিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। আগন্তুক যুবাদের মুখে উল্লাসের হল্লা নাই,—কোন আস্ফালন নাই,—কিন্তু তাহাদের ব্যায়াম-পুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, দৃপ্ত ভঙ্গী—তৈল-পক্ক লাঠি হস্তে দাঁড়াইবার কায়দা দেখিয়াই গুণ্ডার দল শিহরিয়া উঠিল।

পরক্ষণেই হল্লা তুলিয়া তাহারা আগন্তুকদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। উপরের গুণ্ডারাও লাফাইতে লাফাইতে নামিয়া আসিল। অতুল রেবার হাত ছাড়িয়া দিয়া ছাদের আলিসা হইতে ঝুঁকিয়া দেখিল,—সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং দলপতি ও তাহার পরবর্ত্তী চারিজন গুণ্ডা মাথায় চোট পাইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে!

রেবা জানলার গরাদে ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দেখিল—মাথায় পাগড়ী বাঁধা কে একজন অদ্ভুত কৌশলের সহিত গুণ্ডাদের বাধা দিতেছে, কয়েকজন তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতেছে, আর সেই যুবার লক্ষ্য এমন ক্ষিপ্র ও সাংঘাতিক যে, তাহার প্রত্যেক অব্যর্থ আঘাতেই এক একটি গুণ্ডা ধরাশায়ী হইতেছে!—একি মানুষ, না দেবদূত। এত শক্তি, এত সাহস, এমন শিক্ষা, মানুষে সম্ভবে!—পরাজিত গুণ্ডাদলকে ফটকের পথে পশ্চাদপসৃত হইতে বাধ্য করিয়া, সেই যুবা যখন লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সহচরদিগকে কি ইঙ্গিত করিল,—তখন রেবার আতঙ্ক-বিহ্বল সংশয়োদ্বেলিত বুকখানি মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে দোদুল্যমান ফুলটির মত এক অপূর্ব্ব-পুলক-স্পন্দন অনুভব করিল!—মাথায় সুবৃহৎ পাগড়া বাঁধা সেই মধুর-ভীষণ যুবা—তাহার পিতার ভাষিত সেই দেবদূত আজ—তাঁহারই আদরিণী কন্যার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্কা-সূচক অবস্থায় পরিত্রাতা দেবদূতের মতই উপস্থিত!

আট

একটি ঘণ্টার মধ্যেই সুভদ্রা সেবাশ্রমটি যেন সাময়িক হাসপাতালে পরিণত হইল। অঙ্গনে স্তূপীকৃত লুণ্ঠিত সামগ্রী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আহতদের শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। গুণ্ডাদের মধ্যে এগারজন আহত হইয়াছিল, তাহাদের পলায়নের সামর্থ্য ত দূরের কথা,

উত্থানশক্তিও ছিল না। তাহাদিগকেও স্বতন্ত্র ঘরে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা চলিল। আশ্রমের চারিদিকে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রহরায় নিযুক্ত ছিল এবং কয়েকজন যুবক দলবদ্ধ হইয়া আশ্রমের সেবিকাদের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। তখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার স্রোত সহরময় বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও, এই অসম সহিষ্ণু নির্ভীক কর্মিদল অশ্রান্তভাবে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতেছিল এবং তাহাদের চেষ্টায় আশ্রমের সেবিকারা লাঞ্ছিতা হইবার পূর্ব্বেই সহায়তা পাইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেবকদলের মধ্যেই কয়েকজন চিকিৎসক ছিল,—আবশ্যক ঔষধপত্রও যত শীঘ্র সম্ভব আনাইয়া, সুচারুরূপে সকল বন্দোবস্তই সুশৃঙ্খলে চলিতেছিল।

গুণ্ডার দল পলায়ন করিবার অব্যবহিত পরেই রেবা ধীরে ধীরে নামিয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইতেই, মহেন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল: এখন দাঁড়িয়ে ভাববার সময় নেই রেবা, কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাও—তুমি এখানকার সব জান, তোমার সাহায্য সব রকমেই দরকার।

রেবা প্রত্যাশাও করে নাই, মহেন্দ্র তাহাকে এভাবে সম্ভাষণ করিয়া তাহাকেই আবার সহকর্ম্মিণীরূপে আহ্বান করিবে। মনের সমস্ত ব্যথা, গ্লানি, অবসাদ মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন তাহার অস্থির বুক হইতে সরিয়া গেল—পরিতৃপ্তির দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের মুখের দিকে পরিপূর্ণরূপে চাহিয়া, পরম উৎসাহে কোমরে তাহার অঞ্চলখানি জড়াইয়া সে কাজে লাগিয়া গেল। তিনটি ঘণ্টা ধরিয়া সমানভাবে মহেন্দ্র ও তাহার সহকর্ম্মিদের সহিত খাটিয়া আজ সে যে-তৃপ্তি, যে-আনন্দ, যে-সন্তোষ পাইল—শৈশবের কথা তাহার মনে না থাকিলেও, উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে

গোটা মানুষ

এমন হৃদয়ভরা উল্লাস পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিবার সুযোগ সে বুঝি আর কখনও পায় নাই।

সকল বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া, অবিশ্রান্তভাবে তিনটি ঘণ্টা পরিশ্রমের পর মহেন্দ্র বাহিরের সিঁড়িটির উপর আসিয়া সবে বসিয়াছে, এমন সময় রেবা আসিয়া বলিল: একটু দুধ আর কিছু খাবার তোমাকে এনে দিই,—লক্ষ্মীটি, আপত্তি ক'র না।

মহেন্দ্র বলিল: এখন নয় রেবা, ঘণ্টাখানেক পরে এক সঙ্গেই সকলে জল-খাবার খাব।

উপরের ঘর হইতে এই সময় টলিতে টলিতে অতুল নিম্নে আসিয়া বলিল: মহেন্দ্র, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, আমি এই আশ্রমের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বর!

মহেন্দ্র উদাসভাবে উত্তর দিল: তাতে কি হয়েছে?

অতুল বলিল: আমি এখানে উপস্থিত আছি জেনেও, তোমরা আমার কোন অনুমতি নেওয়া আবশ্যক মনে করলে না—এখানকার এই সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে! নিয়ম আর নীতির দিক দিয়ে এটা কত বড় অন্যায় হয়েছে, তা বুঝতে পারছ?

মহেন্দ্র বলিল: তা হবে, কিন্তু এই অন্যায়ের শাস্তিটা কি অতুলবাবু?

অতুল বলিল: সে কাল বুঝতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে রেবা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল: সে না হয় বোঝা যাবে কাল, কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে যে বোঝাপড়াটা দরকার, সেটা ত এখনি হয়ে যাক।

অতুল রেবার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিতেই রেবা ক্রুর হাস্যের সহিত

বলিল : কমিটী কমিটী এখন থাক। মার্শেল-ল জারী হয়েছে। কমিটীর মেম্বর হয়ে তুমি গুণ্ডাদের সঙ্গে প্যাক্ট করেছিলে—তার বিচার এখনই দরকার।

অতুল এবার ধৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া উঠিল : আস্পর্দ্ধা তোমার চরমে উঠেছে রেবা, তুমি জান, মেম্বরের অধিকার প্রয়োগ ক'রে আমি এখনই সব বন্ধ করে দিতে পারি—তোমাকেও এখান থেকে তাড়াতে পারি ?

রেবাও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের স্বরে উত্তর দিল : আর তুমি নিজেই বোধ হয় এটুকু জান না যে, সেবাশ্রমের একজন সামান্য সেবিকাও, কমিটীর কোন মাতব্বরকে 'এমার্জ্জেন্সী কেসের' সময় কাজে যোগ না দিয়ে নির্লিপ্তভাবে ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখলে, ঘাড় ধরে টেনে এনে কাজে নামাতে পারে ?

মহেন্দ্র মুগ্ধভাবে বলিয়া উঠিল : বাঃ ! বেশ কথা বলেছ, রেবা ! তোমার মুখে এমন স্পষ্ট কথা ত শুনিনি কখনও। আজ আমি তোমার কথামতই কাজ করতে চাই।

পরক্ষণে মহেন্দ্র পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গেই একজন কর্ম্মী ছুটিয়া আসিল।

মহেন্দ্র বলিল : মনসারাম, ইনিই সেই অতুলবাবু, এখন শুনছি, এই কমিটীর মেম্বর ইনি, অথচ এ পর্য্যন্ত উপরের ঘরটিতে চুপ ক'রে বসেছিলেন। আমরা কমিটীর বাইরের লোক হয়ে কাজ করব, আর ইনি মেম্বর হয়ে নির্লিপ্তভাবে ব'সে থাকবেন, সে ত ঠিক নয়। এঁকে নিয়ে যাও, কাজ করিয়ে নাও, বিশেষ ক'রে ওঁর গুণ্ডা বন্ধুদের শুশ্রূষার ভারটি ওঁর ওপরেই চাপিয়ে দাও।

গোটা মানুষ

মনসারাম অতুলের হাত ধরিতেই, সে রুখিয়া উঠিল; কিন্তু মনসারাম জিউজিৎসুর একটি ছোট প্যাঁচ কসিয়াই তাহাকে এক সেকেণ্ডের মধ্যে কাবু করিয়া ফেলিল। তাহার পরই অতুলের গায়ের দামী রেশমী পাঞ্জাবীটা ফড় ফড করিয়া ছিড়িয়া দিয়া বলিল: এ জিনিষ মেম্বর সাহেবের গায়ে সাজে না।

এই সময় রেবা অতুলের সেই মণি ব্যাগটি আনিয়া বলিল: গুণ্ডাদের সঙ্গে তোমার প্যাক্টের এটা স্মৃতিচিহ্ন, অতুলবাবু! মনে আছে বোধ হয় তোমার, মহেন্দ্রবাবুর চিঠিখানা তোমার নোটবুক থেকে যে দিন আবিষ্কার করি, সেদিন সেখানা তোমার ঠোটের ওপর ছুঁড়ে মেরে ছিলুম; আজ তুমি এই মণি-ব্যাগটি ঘুষ দিয়ে আমাকেও তোমার স্ত্রী ব'লে পাচার করতে সাহস পেয়েছিলে, তার এই পুরস্কার!

সেই নোট ও মুদ্রাপূর্ণ মণিব্যাগটি রেবা অতুলের নাসিকা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল, আবার সেইভাবে আর্ত্তস্বর তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। কিন্তু মনসারাম তাহার উপর কিছুমাত্র করুণা প্রকাশ না করিয়া, মণিব্যাগটি মহেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া অতুলকে দণ্ডিত অপরাধীর মত টানিয়া লইয়া গেল।

মহেন্দ্র স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিল: রেবা!

রেবা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: এখনও আমাকে এমন স্নেহের স্বরে তুমি ডাকছ আমাকে?

মহেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল: ভুল সবারই হয়; সেটা ত অপরাধ নয়। প্রফেসর পালিত মহাশয়ের চিঠিতে আমি সব জেনেছি।

আর্ত্তস্বরে রেবা বলিয়া উঠিল : আর সেদিন এখানে ? যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি, তা ভাবতেও যে, —

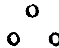
রেবার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র বলিল : সে সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য আমিও ত নিরপরাধ ছিলুম না, রেবা ! আমি হয় ত কথাগুলো তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারিনি।

রেবা অশ্রুপূর্ণ স্বরে কহিল : তবু তুমি আমার দোষ দেখবে না, অপরাধিনী জেনেও আমাকে শাস্তি দেবে না, কিন্তু আমি যে তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে দণ্ড নেব বলে তোমার অনুসরণ করেই এখানে এসেছিলুম !

মহেন্দ্র গাঢ় স্বরে কহিল : তোমার মনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে গেছে ; তুমি এখন ভুলের মোহ কাটিয়ে ত্যাগের তৃপ্তিকে বরণ করবার শিক্ষা পেয়েছ —লালসার শিখায় ঝাঁপ দিতে গিয়ে দেবতার দয়ায় পুণ্যময় তপোবনে ফিরে এসেছ।

রেবা ভাবোদ্বেলিতবক্ষে ভূমিতলে বসিয়া মহেন্দ্রের পা-দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ স্বরে কহিল : সে-ও তুমি—তুমি ! তুমিই আমাকে পতনের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছ ! বাবা তোমাকে চিনে-ছিলেন, তিনি পরপারে যাবার আগে জানিয়েছিলেন—তুমি দেবদূত। আর আমি মানুষের দৃষ্টিতে তোমাকে আগাগোড়া দেখে আজ জানতে পেরেছি—তুমি মানুষ, সত্যিকার মানুষ, তুমিই মহাপুরুষ বিবেকানন্দের স্বপ্নে দেখা—গোটা মানুষ !



দ্বিতীয় রূপ

এক

একটি পয়সা ভিক্ষা দ্যান্ বাবা—ভগবান আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!

রেলের ডেপুটি কনট্রোলার রায় সাহেব কালিদাস কয়াল সকন্যা মোটরে বসিতেই, গাড়ীখানার গা-ঘেঁসিয়া এক কিশোর ভিখারী তাঁহার উদ্দেশে উক্ত স্বস্তিবাচন করিল।

রায় সাহেবের মনটি এ সময় প্রসন্ন ছিল না। আজ তাঁহারই স্বজাতি ও সহপাঠী অনারেবল্ মিঃ নন্দগোপাল নস্করের পৌত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে প্রীতিভোজন; রায় সাহেব সকন্যা সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এই সূত্রে কন্যা মাধুরী পূর্ব্বেই পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিল: সেই ত একখানা গিনি দিয়ে ছেলের মুখ দেখতে হবে,—তার চেয়ে সরু লিকলিকে একছড়া হারে গিনিখানা বাঁধিয়ে যদি ছেলেটির গলায় পরিয়ে দেওয়া যায়—বেশ হয় না বাপী?

মেয়ের রুচির প্রশংসা করিয়া রায় সাহেব বলিয়াছিলেন: বেশ বলেছ বেবি, তাই হবে; আফিস থেকে ফেরবার মুখে সোণা-প্রতিষ্ঠানে অর্ডারটা দিয়ে আস্‌ব।

কন্যা হার ছড়াটির একটি নক্সা আঁকিয়া পিতাকে দিয়াছিল; পিতা সেইদিনই অফিসের পান্টা হ্যারিসন-রোডের সুবিখ্যাত সোণা-প্রতিষ্ঠানে নামিয়া অর্ডারটা দিয়া গিয়াছিলেন; আজই বেলা এগারোটার সময় তাহা পাইবার কথা। কিন্তু সকন্যা রায় সাহেব নির্দ্দিষ্ট সময় সোণা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শুধু আফিস ঘরটিই খোলা আছে;

শো-রুম বা তৎসংলগ্ন বিশাল কর্ম্মশালা—যেখানে অষ্ট-প্রহর লোকজন গিস্ গিস্ করিত, একেবারে জনশূন্য! দ্বারে তালা পড়িয়াছে, মোটা মোটা রেলিংএর ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল—যন্ত্রপাতি যথাযথ স্থানেই পড়িয়া আছে, নাই শুধু যন্ত্রীদল—যাহাদের কর্ম্মচঞ্চল সমাবেশ সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে উৎসাহ-মুখর করিয়া রাখে। সপুত্র মালিক আফিসঘরেই ছিলেন, সবিনয়ে রায় সাহেবকে জানাইলেন যে, কারিকররা ষ্ট্রাইক করিয়াছে, দুইদিন ধরিয়া কারখানা বন্ধ, কাজেই অর্ডার সরবরাহ করা এক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়, এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত।

বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় কোন গ্রাহকই প্রসন্নভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না। রায় সাহেব মিষ্টার কয়ালও পারেন নাই। এই প্রতিষ্ঠান হইতে হার ছড়াটি লইয়াই তাঁহারা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের নস্কর-নিকেতনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন, হঠাৎ এই আশাভঙ্গ! রায় সাহেব অপেক্ষা তাঁহার কন্যা মিস্ মাধুবীর মনস্তাপই বেশী—তাহার নক্সা-টাই মাটী হইয়া গেল! দোকানে এই ধরণের কোন হারই মজুত ছিল না এবং সহরের আর কোন প্রতিষ্ঠানে এখনই এরূপ সামগ্রী পাইবারও সম্ভাবনা নাই; কেন না, রবিবার বহু দোকান বন্ধ থাকে এবং শহরের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরাই মজুরী-সম্পর্কে এই ষ্ট্রাইকে যোগদান করিয়াছে। অগত্যা রায় সাহেব গিনি ও নক্সাটা ফেরৎ লইয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবেই কন্যার সহিত দোকান হইতে বাহির হইয়াছিলেন। রাস্তায় ফুটপাথের ধারেই তাঁহার সুদৃশ্য মোটরখানি দাঁড়াইয়াছিল। মোটরে বসিবামাত্রই এই নূতন উৎপাত—স্পর্দ্ধিত ভিখারী ছোকরাটি

গোটা মানুষ

একেবারে গাড়ীখানার গায়ে গা লাগাইয়া সুর করিয়া কহিল: একটি পয়সা ভিক্ষা দ্যান বাবা—ভগবান আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!

রায় সাহেবের দুই কাণের ভিতর কে যেন একজোড়া লৌহশলাকা ঢুকাইয়া দিল! তাঁহার চিত্তের সমস্ত বিরাগটুকু গাড়ীর ধারে আশা-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ভিখারী ছেলেটির উপরেই ছড়াইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: পুলিস—পুলিস!

পিতার এই কঠোর আচরণ ও অপ্রত্যাশিত তর্জ্জন পার্শ্বোপবিষ্টা কন্যাকে যেমন সচকিত করিয়া তুলিল, পথচারীদের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হইল এবং পরক্ষণেই গাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে যেন জনতার একটা চক্রব্যূহ রচিত হইয়া গেল।

ভিখারী ছোকরাটা ইহাতে সাহস পাইয়া মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করিয়া কহিল: বাঃ! বেশ বড়লোক ত দেখছি! চাইলুম একটি পয়সা ভিক্ষে, আর আপনি ডাকৃছেন পুলিস! 'দেব না' বললেই ত পারতেন! আমি কি চোর?

রায় সাহেব কণ্ঠের স্বর অতিশয় তীক্ষ্ণ করিয়া কহিলেন: আলবৎ! সেই মতলবেই ত গাড়ীর গা-ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিস্! আমি তোকে জেলে দেবই।—কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাড়ীর গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইয়া পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন: এই পুলিস—

ঠিক এই সময় এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ যুবা দুই হাতে ভীড় সরাইয়া একেবারে গাড়ীর কাছে—ভিখারী ছোকরাটির ঠিক্ পাশে আসিয়া

দাঁড়াইল এবং রায়সাহেব কয়ালকে পুলিসের উদ্দেশে দ্বিতীয় আহ্বানের অবসর না দিয়াই দৃঢ়স্বরে কহিল : এটা চৌরঙ্গীও নয়, আর আপনিও সাহেব নন ; নাই-বা কিছু দিলেন ওকে, কিন্তু মিছিমিছি চেঁচিয়ে লোক জড় করছেন কেন বলুন ত ?

ছেলেটির উক্তি ও আকৃতি জনতার প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। এরূপ ঋজু দীর্ঘদেহ সচরাচর দেখা যায় না। যতগুলি লোক মোটর-খানিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই ছেলেটির মাথা তাহাদের সকলের মাথার উপর অন্তত একটি বিঘত উঁচু হইয়া যেন অপর দেহীদিগকে ব্যঙ্গ করিতেছিল। গাড়ীর ভিতর হইতে মাধুরীও তাহাকে দেখিল, ছেলেটির দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং তাহার পিতার উদ্দেশে কথিত কয়টি কথার বৈচিত্র্য তাহার অন্তরটির উপর বুঝি একটা আঁচড় টানিয়া দিল।

বাহিরের দিকে মুখখানা আর একটু বাড়াইয়া রায় সাহেব ছেলেটির আপাদমস্তক এক নিমেষে দেখিয়া লইলেন। রায় সাহেবের অন্ধবিশ্বাস, এক দৃষ্টিতেই তিনি মানুষ চিনিতে পারেন। কন্‌ট্রোলার আফিসে যে সব কেরাণী তাঁহার অধীনে কাজ করে এবং প্রত্যহ যে সকল বিভিন্ন দেশীয় উমেদার অর্ডার সরবরাহ করিবার আকাঙ্ক্ষায় আসিয়া থাকে, নিমেষের মধ্যেই এই দৃষ্টি দিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মনের খবরটুকু পড়িয়া লইতে নাকি তাঁহার এতটুকু বিলম্ব হয় না! এখানেও হইল না। এক নজরেই আপাদমস্তক দেখিয়া তিনি মনে মনে ছোক্‌রাটির সম্বন্ধে ইহাই সাব্যস্ত করিয়া লইলেন যে, চেহারার দিক্ দিয়া ছোক্‌রা যতই লম্বা চওড়া হউক না কেন, ও-দিকে ঢুঁ-ঢুঁ! বেওদণ্ডে বেকার না হইলে এই বয়সের কোন সহুরে ছেলের এ ধরণের হালচাল হয় না।

গোটা মানুষ

ছেলেটীর গায়ে বোতাম-খোলা টুইলের একটা যাচ্ছেতাই সার্ট এবং পরণের খাটো কাপড়খানা যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতেছিল যে, সে বিত্তহীন্ বেকার। হাতখানাও খালি, তাহাতে এই বয়সের ছেলেদের অপরিহার্য্য রিষ্ট্-ওয়াচ নাই। মাথার চুলগুলি এলোমেলো,—কস্মিন্-কালেও বুঝি চিরুণী পড়ে নাই। পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেলও জোটে নাই—এখানেও দেখা যাইতেছিল দেশী মুচির তৈরী দুই পাটি ঢাউস্ চটি, তাহারও দুই তিন স্থানে চামড়ার তালি। এহেন মূর্ত্তিমান বেকার যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত—একটা ভিখিরীর পক্ষ লইয়া সে কাহার মুখের উপর এত বড় কথা বলিয়াছে?

যেমন কল্পনা, তৎক্ষণাৎ কার্য্য। দুই চক্ষু পাকাইয়া রায় সাহেব কহিলেন: তুমি জান রাস্কেল, কার মোটরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছ?

আশ্চর্য্য, ছেলেটি কিছুমাত্র উষ্ণ না হইয়া বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিল: তার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভীড় আর কেলেঙ্কারী না বাড়িয়ে আপনার সরে পড়াই এখন প্রয়োজন হয়েছে; সে সুযোগ আমিই দিয়ে যাচ্ছি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হতবুদ্ধি কিশোর ভিক্ষুকটির হাতখানি ধরিয়া ক্ষিপ্রভাবে জনতার ব্যূহের বাহিরে লইয়া গেল।

এতবড় আঘাতটা যে বায়ুব প্রবাহে পড়িয়া ব্যর্থ হইবে, রায় সাহেব তাহা কল্পনাও করেন নাই। দুইটী বিদ্বেষভাজন তাঁহার পদমর্য্যাদার পরিচয়টুকু না পাইয়াই এভাবে অদৃশ্য হওয়ায়—তাঁহার মেজাজ আরও

তাতিয়া উঠিল এবং তাহার ঝাজটুকু গাড়ীর সোফারের উপর ফেলিয়া হুমকী দিলেন : এই শূয়ার—চালাও !

মনিবের মেজাজের সহিত সোফারের পরিচয় ছিল। সুদূর বিহার হইতে বাঙ্গলাদেশে সে রুটীর সংস্থান করিতে আসিয়াছে এবং সেই সূত্রে মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছে যে, কাজ গুছাইতে হইলে মনিবের মন রাখা চাই, মান-ইজ্জতের কোন দামই সেখানে নাই। সুতরাং বিক্ষুব্ধ জনতাকে চমৎকৃত করিয়াই অম্লানবদনে সে মোটরে ষ্টার্ট দিল।

মাধুরী এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক ছিল। গাড়ী চলিতেই, রায় সাহেব কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু দোকান হইতে বাহির হইয়া মোটরে বসিবার সময় যে বিরক্তির ছায়া কন্যার মুখে পড়িয়াছিল, এখনও কি তাহাই লক্ষ্য করিলেন ? এখানেও কি দৃষ্টিবিভ্রম ? রায় সাহেব বুঝিলেন, সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে এই প্রথম অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া কন্যা ব্যথা পাইয়াছে ; তাহার এই ব্যথাটুকু নিশ্চিহ্ন করিতে পুনরায় তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সেই অদৃশ্য ছোকরাটির উদ্দেশেই কহিলেন : লোফার, স্কাউণ্ড্রেল ! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোই হচ্ছে এই সব গোঁয়ারদের কাজ !

বিষণ্ণ মুখখানি তুলিয়া মাধুরী শুধু একটিবার পিতার ক্রোধারক্ত মুখের দিকে তাকাইল ; পরক্ষণেই সে গাড়ীর গবাক্ষটির উপর মাথাটা হেলাইয়া দিল। যে আঁচড়টি একটু পূর্ব্বে তাহার মনের উপর পড়িয়াছিল, তাহা তখনও মুছিয়া যায় নাই, বরং সেটি আরও স্পষ্ট হইয়া এই প্রশ্নই তুলিতেছিল—জনতার কদর্য্য দৃষ্টি হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিবার

জন্যই সেই 'স্কাউণ্ড্রেল ছেলেটি' স্বেচ্ছায় ঘটনার প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া অদৃশ্য হয় নাই কি?

দুই

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের নস্কর-নিকেতনটি সাধারণতই সৌষ্ঠবান্বিত; উৎসব উপলক্ষে তাহার বাহ্যিক শোভা ও সৌন্দর্য্য আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। দেউড়ীর উপর সুদৃশ্য মঞ্চে নহবত বসিয়াছে, শ্রুতিমধুর সুরে পথ ও পল্লী মুখর। দ্বারে বুকে-তকমা-আঁটা আশা সোঁটাধারী বরকন্দাজের দল। দেউড়ীর ভিতরে সুবিস্তীর্ণ উদ্যান, মাঝখান দিয়া লাল কাঁকরের ঋজু রাস্তাটি দেউড়ী হইতে বরাবর সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমের বারান্দায় গিয়া মিশিয়াছে। আজ আবার ইহার উপর রঙিন্ বনাতের আস্তরণ পড়িয়াছে।

দক্ষিণ বাঙ্গলার যে কয়টি অনুন্নত জাতি শিক্ষায় ও সভ্যতায় সমাজের নিম্নস্তর আশ্রয় করিয়া এ পর্য্যন্ত অবজ্ঞাত হইয়া ছিল, নন্দ-গোপাল নস্কর অসাধারণ প্রতিভার প্রখর আলোটি তাহাদের বিস্ফারিত চক্ষুগুলির উপর ফেলিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এ যুগে উচ্চ শিক্ষার চাপরাশ ও তৎসহ প্রচুর টাকার রোজগার থাকিলে—সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিতে হয় না, লাট সাহেবের সভায় পর্য্যন্ত বসিতে পারা যায়।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে দুইটি ছেলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তাহাদের প্রথমটি

নন্দগোপাল নস্কর, অপরটি কালীদাস কয়াল। ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুর সাবডিভিসন হইতে এই দুইটি ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এরূপ সাফল্যলাভ এবং চব্বিশপরগণার অনুন্নত জাতির পক্ষে পরীক্ষা সম্পর্কে কৃতিত্ব-প্রকাশ সেই প্রথম।

তাহার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে একই জিলার ও জাতির দুই মেধাবী ছাত্রের সংযোগ ও সম্প্রীতি। ইংরাজী ও অঙ্কে এম-এ পাশ করিয়া কালিদাস ই, আই, রেলের আফিসে প্রবেশ করেন এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই কতিপয় কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়—প্রত্যেকটিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া অফিসারের পদে উন্নীত হন। সেই সূত্রে এখন তিনি রায় সাহেব কালিদাস কয়াল ; যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা দুর্লভ। বহু শ্বেতাঙ্গেরও আজ তিনি উপরওয়ালা। অফিসে তাঁহার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা প্রচুর।

নন্দগোপাল এম-এ, বি-এল, খেতাব পাইয়া হাইকোর্টের বারে নাম লিখাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপর কমলা প্রসন্ন হইলেন। পসার জমিয়া গেল, সৌভাগ্যের চাকা উন্নতির পথে দুর্ব্বার গতিতে ছুটিয়া চলিল। মান-সম্ভ্রম-উপার্জ্জন-খ্যাতি-প্রতিপত্তি—অবশেষে সরকারের মনোনয়নে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের আসন লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে নামের আগে অনারেবল্ শব্দটির সংযোগ হইয়া গেল।

বহু সংখ্যক সুদৃশ্য সোফা, আরাম-কেদারা ও আনুষঙ্গিক মহার্ঘ্য আসবাবে সজ্জিত সুবৃহৎ ড্রইং-রুমটির পিছনেই বিশাল মণ্ডপে বিলাতী কায়দায় প্রীতি-ভোজের বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। সহভোজনে যাঁহারা সংস্কারমুক্ত, এই ঘরে তাঁহারা ভোজের টেবিলে সমবেত

হইয়াছেন; অনেকেই সস্ত্রীক বা সকন্যা ভোজে যোগ দিয়াছেন। একখানি ছোট টেবিল আশ্রয় করিয়া সকন্যা রায় সাহেব কালিদাস কয়ালকে ভোজের মধ্যস্থলে উপস্থিত দেখা গেল।

এতক্ষণ ড্রয়িং-রুমে গান-বাজনা হইতেছিল, এই মাত্র গৃহস্বামীর সবিনয় আহ্বানে নিমন্ত্রিতগণ ভোজের স্থানে সমবেত হইয়াছেন; পরিবেষকগণ পরিবেষন আরম্ভ করিয়াছে; গৃহস্বামী অনারেবল নন্দ-গোপাল নস্কর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া অভ্যাগতদের পরিচর্য্যা ও অভ্যর্থনায় তৎপর। বাহিরের ঘরে উপস্থিত কর্ম্মচারীদিগকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে, অতঃপর কোন নিমন্ত্রিত আসিলেই ভোজের মণ্ডপে লইয়া আসিবে। যাঁহারা বিলম্বে আসিতেছিলেন, গৃহস্বামী তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ভোজের আসনে বসাইয়া দিতেছিলেন. কয়েক-খানি আসন তখনও খালি প'ড়িয়াছিল।

ছুটির মধ্যাহ্ন, জঠরে অদম্য ক্ষুধা, সম্মুখে সুবৃহৎ ডিসে প্রচুর আয়োজন, সকলেই ভোজনপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন; এমন সময় গৃহস্বামীর আন্তরিকতাপূর্ণ উচ্চকণ্ঠের সাদর আহ্বান সমবেতগণকে চমকিত করিয়া দিল,—আসুন পরশুরামবাবু, আসুন-আসুন, আপনি হচ্ছেন যজ্ঞেশ্বর, অথচ এলেন—যজ্ঞের শেষে!

ভোজনপাত্র হইতে ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলিয়া প্রায় সকলেই দ্বারের দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে গৃহস্বামীর এই আহ্বান সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই; কেননা নবাগত তখনও দ্বারের এপাশে প্রবেশ করেন নাই। যাঁহারা দ্বারের সামনাসামনি বসিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রায় সকলেই সকৌতুকে দ্বারের দিকে কৌতুহলী

দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, কিন্তু যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহস্বামীর এইরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ আহ্বান, তাহার চেহারাখানা স্পষ্ট দেখা গেল না। যে কয়খানা টেবিল দরজার সামনা সামনি পড়িয়াছিল এবং যাহারা সেগুলি ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারাই শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেখিলেন—বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না—এমন এক দীর্ঘাকৃতি যুবা দ্বারের দিকে আসিতেছে, তাহার পিছনে খর্ব্বাকৃতি এক কিশোর।

এই দলে ছিলেন রায় সাহেব কালিদাস কয়াল ও তাঁহার কন্যা মাধুরী। মণ্ডপের মধ্যস্থলে যে টেবিলটির সম্মুখে পিতা-পুত্রী বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে দরজাটি একেবারে সোজা ও দরজার ওপারের অনেকটা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। সহসা সাপ দেখিয়া মানুষ যেভাবে চমকিয়া উঠে, অপ্রত্যাশিতের এই আকস্মিক উপস্থিতি বুঝি তাঁহাকে ততোধিক বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া দিল, গভীর বিস্ময়ের মধ্যেও ঈষৎ সংশয়—সেই লোকটা—না, অন্য কেহ?

সংশয়টুকুর নিষ্পত্তি করিতে মৃদুস্বরে কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন: বেবী, হ্যারিসন রোডের সেই লোফারটা নয়?

পিতার প্রশ্নে সচকিত কন্যা দ্বারের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আস্তে আস্তে ঘাড়টি নাড়িয়া জানাইল,—হ্যাঁ, সে-ই ভদ্রলোক!

ইতিমধ্যেই আগন্তুক আহ্বায়কের সম্মুখে আসিয়া কহিতেছিল: দেরী হবার একটু কৈফিয়ৎ আছে। চিঠিতে আপনি স্পষ্ট জিগির দিয়াছেন যে, সবান্ধবে আসা চাই। বান্ধব সংগ্রহ করতেই দেরী হয়ে গেছে।

প্রসন্ন মুখখানা কিঞ্চিৎ গম্ভীর করিয়া গৃহস্বামী আগন্তুকের পার্শ্ববর্ত্তী

খর্ব্বাকৃতি কিশোরটির দিকে চাহিয়া কহিলেন: ইনি বুঝি?—আসুন, আসুন!

রায় সাহেবের মনে হইল, সাপটা যেন ফণা তুলিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে! মুখের ভঙ্গী বীভৎস করিয়া কন্যাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: সেই ভিকিরীটা নয়?

কন্যা বিহসিত মুখখানি পিতার কাণের কাছে তুলিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল: সেই-ই, তবে জামা-কাপড় পালটে এসেছে।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া রায় সাহেব আগন্তুকদ্বয়ের দিকে তাকাইতেই দেখিলেন, গৃহস্বামীর একখানি হাত তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে এবং অপরখানি ভোজন-মণ্ডপের ভিতর দুই খানি খালি আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে,—ঐ দিকে দুটো সিট খালি রয়েছে, আসুন।

বন্ধু-গৃহস্বামীর এই আহ্বান যেন রায় সাহেবের পিঠের উপর সপাং করিয়া চাবুকের একটা ঘা দিল। তিনি সহসা সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন: তুমি কি আমাদের জাত মারতে চাও, নন্দ?

প্রশ্নটা সকলকেই স্তব্ধ করিয়া দিল। প্রত্যেকের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি গৃহস্বামীর মুখে নিবদ্ধ হইল। আগন্তুক তখনও দ্বারের এপারে প্রবেশ করে নাই, সঙ্গীর হাতখানি ধরিয়া ও-পারে দাঁড়াইয়াই বুঝি প্রবেশ সম্বন্ধে ইতস্তত: করিতেছিল; সহসা ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠের এইরূপ মন্তব্য শুনিয়াই, ভিতরের দিকে তাহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি পড়িতেই সকন্যা রায় সাহেবের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল এবং

তৎক্ষণাৎ সেই দৃষ্টিই বুঝি ধরিয়া ফেলিল—ইহারা কে এবং কেন এ-কথা বলিতেছে ?

গৃহস্বামীও বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু আছে। তথাপি বন্ধুর দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিলেন : হ'ল কি হে ?

রায় সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন : রাস্তার ভিখিরীর সঙ্গে বসে কি শেষকালে তোমার এখানে পাত পাড়তে হবে,—এইটিই জিজ্ঞাসা করছি ?

গৃহস্বামী কহিলেন : এ কথার মানে ?

কিন্তু কথাটার মানে আর রায় সাহেবকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইল না, আগন্তুকই তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। সহজ ও স্নিগ্ধ কণ্ঠেই সে কহিল : মানেটা আমাদেরই নিয়ে, ওঁর আশঙ্কা, আমরা ভেতরে গিয়ে বসলেই ওঁর জাত যাবে। আবার এমনই মজা, আমরাও ভাবছি, যেখানে এ রকম বিজাতীয় ব্যাপার, আমরা সেখানে কি করে যাই। কেননা, আমাদের জেতের চোদ্দপুরুষেও কেউ কখনো টেবিলে বসে খায় নি,—মাটির মেঝেয় পিঁড়ি পেতে বসে কলাপাতায় বরাবর খেয়ে এসেছি, এখনও খাই, সেই ব্যবস্থাই আমাদের দুজনের জন্যে করে দিন না কেন,—'মানে' তাহলে এইখানেই মিটে যায়।

গৃহস্বামী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন : সে ব্যবস্থাও আলাদা আছে ; বেশ, তাই করছি।

গৃহস্বামীর যোগ্য পুত্র ও অন্যান্য পরিজন কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নির্দেশ মত তাহারা নবাগতদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

গোটা মানুষ

কিন্তু আর সকলের মুখ ও চক্ষুগুলির উপর কৌতূহলের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন উঠিল: লোকটা কে? ব্যাপারখানা কি?

ব্যাপারখানা রায় সাহেব অফিসিয়্যাল রিপোর্টের মত এমন সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলেন যে, ঘটনাটা যেন সমবেত প্রত্যেকেরই চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল।—বাঁটুল ছোঁড়াটা কেমন করিয়া গাড়ীর গা-ঘেঁসিয়া তাঁহার পকেট মারিবার চেষ্টা করে, এবং তিনি পুলিস ডাকিতেই ঐ মনুমেণ্টটা কি ভাবে আসিয়া তাহাকে লইয়া ভীড়ের ভিতর দিয়া সরিয়া পড়ে, রায় সাহেবের বলিবার ভঙ্গীতে তাহা সকলেরই উপভোগ্য ও বিশ্বাস্য হইল। কিন্তু পরক্ষণে একই সংশয় প্রত্যেকের চিত্তে দোলা দিল—যে লোক পকেট কাটার সাহায্যকারী এবং তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া নিমন্ত্রণ বাড়ী আনিতে সাহস করে, সে-লোকের সহিত অনারেবল নস্করের এত মাখামাখি কেন?

সকলের মনে এই সংশয় রায় সাহেব নিজেই প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করিলেন: তোমার ঐ যজ্ঞেশ্বরটি কে হে নন্দ,—তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা কি শুনি?

নন্দবাবু কহিলেন: তেমন ঘনিষ্ঠতা কিছু নেই, আর জানা শোনাও যে বেশীদিনের, তাও নয়—

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে রায় সাহেব কহিলেন: বটে! তাই রিসেপ্‌সনের অত ঘটা, আর একবারে যজ্ঞেশ্বর বানিয়ে—

বাধা দিয়া নন্দবাবু কহিলেন: তার মানে, এই শুভ কর্ম্মটির যা কিছু

আয়োজন দেখছ, সে সমস্তই উনি সরবরাহ করেছেন। এই প্যাণ্ডেল বাঁধা থেকে পাতা পুরুয়া পর্য্যন্ত উনি জুগিয়েছেন।

রায় সাহেবের ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন: ও! তাহলে একজন ভবঘুরে কন্‌ট্রাক্টর বল?

নন্দবাবু কহিলেন: তাই। এই সঙ্গে অনেক রকম ব্যবসাও আছে।

রায় সাহেবেরও ওষ্ঠপ্রান্তে পুনরায় সেই ব্যঙ্গের হাসি এবং সেই সঙ্গে বক্রোক্তি: ঠিক। একটা বড ব্যবসার পরিচয় আমি ত নিজেই পেয়েছি, অন্যগুলোর কথা তোমার মুখেই শুনি?

নন্দবাবু কহিলেন: তুমি ওর সম্বন্ধে অবিচার করছ কালী। হতে পারে, ওর আজকের কাজটা তোমার ভাল লাগেনি, কিন্তু যে-সব কাজ উনি ব্যবসার দিক দিয়ে করে থাকেন, তুমি আমি কস্মিনকালেও তা করতে পারব না; সে-সব শুনলে, তোমাকে স্বীকার করতে হবে—পথের ভিখিরীকে কোলে টেনে এমন করে আপনার করে নেওয়া এই রকম কর্ম্মীর পক্ষেই সম্ভব।

প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে রায় সাহেব কহিলেন: বল কি হে, এমন! বেশ ত, তোমার কর্ম্মী যজ্ঞেশ্বরের কর্ম্মের ফিরিস্তি গোটাকতক শুনিয়ে দাও, ঐ দেখ না হে, সবাই শোনবার জন্য চুলবুল করছে,—এসবও ভোজের অঙ্গ হে,—ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

নন্দবাবু কোনও রূপ ভূমিকা না করিয়া বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিলেন: হাইকোর্টে একটা মামলার ব্যাপারে পরশুরামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। মামলাটা ছিল সাধারণ, কিন্তু সেটা শেষে হয়ে দাঁড়ায়

গোটা মানুষ

অসাধারণ,—বাঙ্গালী ভার্সেস বিহারী! একটা কাপড়ের হাটের ইজারাদারী নিয়ে মামলার সৃষ্টি। মামলার বাদী বিহারী মহাজন, নাম তার বাবুদাস খান্না; প্রতিবাদী এই পরশুরামেরই হাতের এক বাঙালী দোকানদার। তাঁর ঐ হাটের 'প্যজেসন' চাই। তার পেছনে উনি—এই পরশুরাম বাবুই—জলের মত টাকা ঢালতে পেরেছিলেন বলেই শেষে তিনি হাটের ইজারা পান। আমি তাতে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—কি লাভ আপনার হল? উত্তরে উনি বললেন: শুনতে চান?—এতে একশো বাঙালী ব্যাপারীর অন্ন সংস্থানের উপায় করা গেল। খান্নার ঝোঁক, হাট থেকে বাঙালী খেদিয়ে বেবাক বেহারী বসাবে; আমারও রোক, বাঙলার হাটে খালি বাঙালী বসবে। এ রোক আমার রক্ষা হয়েছে; এতে লাভ নেই বলছেন?

উপাদেয় ভোজ্য মুখে পুরিয়া ভোজনকারীদের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি জড়িতকণ্ঠে কহিলেন: এ যে কমিয়ুন্যাল কাণ্ড দেখছি!

অপর একজন তৎক্ষণাৎ কহিলেন: না, এটা হচ্ছে প্রভিন্সিয়াল—

রায় সাহেব কহিলেন: যাই হোক, এ কিন্তু ভাল নয়।

কন্যা মাধুরী এতক্ষণে পিতার মুখের উপর তাহার দুইটি আয়ত চক্ষুর প্রশ্নভরা দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল: কেন ভাল নয়? খবরের কাগজ খুললেই ত আজকাল দেখতে পাই—বেহার থেকে ঘটা করে বাঙ্গালী তাড়াবার আয়োজন চলেছে, তবে?

কন্যার এ প্রতিবাদ রায় সাহেবের ভাল লাগিল না, কিন্তু কথাগুলি কাছাকাছি উপবিষ্ট যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারাই এই স্পষ্টবক্তা মেয়েটির দিকে চাহিয়া মনে মনে তারিফ করিলেন।

রায় সাহেব পুনরায় বন্ধুর দিকে চাহিয়া কহিলেন : তাহলে তোমার যজ্ঞেশ্বর হচ্ছেন একটা বড়রকমের হ্যাটের মালিক ?

নন্দবাবু কহিলেন : শুধু তাই বা কি করে বলি ! আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু ঐ লোকটির ওপর তোমার মনের যে রকম বিরাগ দেখছি, বলেও লাভ নেই, বরং সেগুলো বিরক্তিরই কারণ হবে।

রায় সাহেব কহিলেন : না হে না, তা কেন ? বলই না শুনি—ওর অন্যান্য কর্মের ফিরিস্তি ?

নন্দবাবু কহিলেন : শুনবে ? যে-সব কাজ বা কারবারে আমরা পেছিয়ে আছি, উনি তাতেই এগিয়ে গিয়ে লেগে পড়েছেন। বছর দুই আগেও যে সব কাজ অ-বাঙ্গালীদের একচেটে ছিল, উনি তার অনেকগুলো ছিনিয়ে নিয়েছেন , আর বেছে বেছে যত সব বেকার ভবঘুরে বাপ-মায়ের খেদানো বওয়াটে গোছের বাঙ্গালী ছেলে যোগাড় করে, তাদের সেই সব কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন কারবার কলকেতায় নেই, যাতে উনি হাত দেন নি। আগেই ত বলেছি, এই ভোজের যা কিছু উনিই যুগিয়েছেন, অথচ বাজারের তুলনায় দাম সস্তা, আর প্রত্যেক জিনিসটি খাঁটি , রসুয়ে বামুন পর্য্যন্ত ভদ্রলোক কাজের বাড়ীতে যোগান দেন, আর এখানেও স্পেশালিটি এই—তারা সবাই বাঙ্গালী, উড়িষ্যা বা পাটনার আমদানী নয়।

রায় সাহেবের মুখখানি আপনা আপনিই অতিশয় গম্ভীর হইয়া গেল। নন্দবাবুর কথাগুলি বোধ হয় অনেকেরই চিত্তে অস্বাভাবিক রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়াছিল। সত্যই, এ বিষয়ে তাঁহাদের কাহারও দৃষ্টি

কোনওদিন আকৃষ্ট হইয়াছে কি? স্বজাতির পরিপোষণ সম্পর্কে অবহেলায় তাঁহারা প্রত্যেকেই কি অল্প-বিস্তর অপরাধী নহেন?

তিন

প্রীতিভোজনের পর সকলেই সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে সমবেত হইয়াছিলেন। পান, সিগার ও পানীয়ের আদান-প্রদান চলিতেছিল। এমন সময় পরশুরাম তাহার সঙ্গীটিকে লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। মূল্যবান সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সজ্জিত এমন চমকপ্রদ ঘর, ঘরের ভিতর এতগুলি সুবেশধারী ভদ্রলোক, এবং তাহাদের মধ্যে আবার আশ্চর্য্য রকমের সুন্দরী কতিপয় মেয়েলোকের সমাবেশ—পরশুরামের নূতন বান্ধবটির মাথা বুঝি ঘুরাইয়া দিল, ভিতরের দিকে তাহার পা আর উঠিতে চাহে না। পরশুরাম সঙ্গীর অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে আগের দিকে ঠেলিয়া একখানা সোফায় বসাইয়া দিল এবং নিজেও সেই সোফায় তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল।

কক্ষের এতগুলি নরনারীর প্রত্যেকেরই দৃষ্টি এই দুইটি অতিথির দিকে যেন নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

ব্যারিষ্টার মিষ্টার সেনই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিলেন। পরশুরামের দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন: আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই নন্দবাবু আমাদের শুনিয়েছেন। শুনে আমরা খুসীই হয়েছি; কিন্তু আপনার সঙ্গীটির পরিচয় ত কিছুই পাইনি!

গোটা মানুষ

পরশুরাম তাহার অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বক্তার বক্র মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া, কথাটার উত্তরে কহিল : আমার কি পরিচয় আপনি পেয়েছেন !

মিষ্টার সেন কহিলেন : আপনি একজন পাকা ব্যবসাদার, আপনার বুকের পাটাটা ভারি শক্ত—

পরশুরাম কহিল : এদিক্ দিয়ে এ ছেলেটির বুকের পাটা আমার চেয়েও শক্ত ; যেহেতু, এ ছোকরা জাত-চাষা ।

চাষাও চাষীদের লইয়া ভারতব্যাপী আন্দোলনের কথা ভাবিয়া অনেকেই পরশুরামের পার্শ্বোপবিষ্ট খর্ব্বাকৃতি ছেলেটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলেন ।

মিষ্টার সেন কহিলেন : মাফ্ করবেন, আমরা কিন্তু রায় সাহেবের মুখে শুনেছি, ঐ ছোকরা তাঁর গাড়ীর গায়ে গা লাগিয়ে পকেট মারবার ফিকিরে ছিল ।

কথাটায় পরশুরামের মুখে কোনও পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা গেল না, কিন্তু ছোকরার যে মুখখানা তাহার দেহের সঙ্গে অস্বাভাবিক রকমে নীচু হইয়াছিল, মিষ্টার সেনের এই তীক্ষ্ণ মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা সোজা হইয়া উঠিল । একটা সরমসঙ্কুচিত পকেটমারের এরূপ আকস্মিক সপ্রতিভ অবস্থা—তাহার চাহনীর তীক্ষ্ণতা—হাইকোর্টের অভিজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ীকে অভিভূত করিল কি ?

কিন্তু পরশুরামের উত্তর ঘটনাটির গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল । সে স্নিগ্ধকণ্ঠে জানাইল : না ; কিছু পাবার প্রত্যাশায় এ

গোটা মানুষ

ছোকরা ওঁর কাছে হাত পেতেছিল, পকেটে হাত দেবার ইচ্ছা ওর ছিল না।

রায় সাহেব অন্যদিকে মুখখানা ফিরাইয়া লইলেন, কথাটার প্রতিবাদ করিয়া বিতর্কের সৃষ্টি করিলেন না। মাধুরী আড়নয়নে একবার পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া, সেই দৃষ্টি পুনরায় মিষ্টার সেনের দিকে নিক্ষেপ করিল।

মিষ্টার সেন কিন্তু এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ দিলেন না, পুনবায় প্রশ্ন করিলেন,—তাহলে হাত পাতাই ঐ ছোক্‌রার ব্যবসা?

পরশুরাম কহিল: হাত পাতা কার ব্যবসা নয়, বলুন ত? এ যুগে সবাই হাত পেতেই আছে। যাঁরা য্যাড্‌ভোকেট, মক্কেলের কাছে হাত পাতছেন; ডাক্তার পাতছে হাত পেসেণ্টের কাছে, জমিদার প্রজার কাছে, দোকানদার খদ্দেরের কাছে; ছোটবড় সবারই ব্যবসা—হাতপাতা।

মিষ্টার সেন কহিলেন: কথাটা ঠিক। তবে কি জানেন? এরা কেউ শুধু শুধু হাত পাতে না, একটা কিছু দিয়ে, তার বিনিময়ে অন্য কিছু নিতে হাত পাতে। কিন্তু আপনার ঐ ছোক্‌রা—

পরশুরাম কহিল: একটা কিছু নিশ্চয়ই দেয়, সেটা কি শুনবেন? অভাব, দুঃখ, দৈন্যের পরিচয়। তা থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়।

—আপনি তাহলে কিছু পেয়েছেন বলুন!

—নিশ্চয়ই। যদি আপনাদের আগ্রহ আর ধৈর্য্য থাকে, তাহলে আমি আপনাদের সামনে এই অপরিচিত ভিক্ষুক ছেলেটিকে উপলক্ষ করে এমন কিছু নূতন ছবি দেখাতে পারি—সিনেমায় কোন রোমাঞ্চকর

ছবির চেয়ে যার আকর্ষণ কম নয় এবং পল্লী-বাঙ্গালার বছর চল্লিশ আগেকার ইতিহাসের সঙ্গেও যে ঘটনাটা জড়িয়ে আছে।

—বটে!

—এমন ?

—তাহলে শোনাই যাক না।

—ভালই ত' এক সঙ্গে ছবি দেখা এবং গল্প শোনা ; মন্দ কি !

পর পর অনেকেই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পরশুরামের দিকে চাহিলেন। মহিলাদের চক্ষুগুলির দৃষ্টিতে যুগপৎ কৌতুক ও আগ্রহের চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

পরশুরাম অতঃপর তাহার আলোচ্য আখ্যান-বস্তুটি এইভাবে ব্যক্ত করিল,—

আজ যেমন আমরা—অবশ্য আমার মত গরীব যারা—অন্নের অভাব অনুভব করছি। চল্লিশ বছর আগেও বাঙ্গলার সরকার হঠাৎ প্রেসিডেন্সী সার্কেলের সরকারী ঘোড়াদের ঘাসের অভাবে বিব্রত হয়ে ওঠেন। বাঁধা দানা দিনরাত ঠুসে ঘোড়ারা নাকি ব্যাধির সৃষ্টি করে। সরকারী ঘোড়া-মহলে ব্যাপকভাবে রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে মড়ক দেখা দেয়। সরকার ভেবেই অস্থির, এর কি প্রতিকার করা যায় ? অনেক ভেবেচিন্তে ভেটারনারী ডাক্তাররা ব্যবস্থা দিলেন, এর উপায় হচ্ছে—ঘোড়াদের খাবারের দানার ভাগ কমিয়ে টাটকা ঘাসের ভাগ বেশী পরিমাণে দেওয়া। কিন্তু তখন সমস্যা এল, এত ঘাস কোথায় পাওয়া যায় ? এই নিয়ে আবার জল্পনা-আলোচনা আরম্ভ হ'ল। এই সূত্রে সরকারী ওয়াকিবহালমহল জানালেন যে, ফোর্ট উইলিয়মের এলাকাধীন

অঞ্চলে দেদার সরকারী জমি পড়ে আছে। তাদের কোন বিলিবন্দোবস্ত নেই। পল্টনের লোকেরা এই সব পতিত জমি থেকে নিত্য-নিয়মিত-ভাবে যাতে ঘাস কেটে আনতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হোক। কর্ত্তারা তখন যেন অকূল কূল পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাহার জারী হয়ে গেল। আলিপুরের সদরে খুব লম্বা চওড়া একটা ফাঁকা যায়গায় তখন ঘোড়াদের ছাউনী পড়েছিল; হাজার হাজার ঘোড়ার সে-একটা দেখবার মত ব্যারাক, লাটসাহেবদের বডি-গার্ডের ঘোড়াগুলোও এই ব্যারাকে থাকত, এখনও থাকে; সে ব্যারাক এখনও আছে।

মিষ্টার সেন কহিলেন: ওরে বাবা, মিষ্টার পরশুরাম যে রীতিমত একটা ভেটারনারী ষ্টোরী ফেঁদেছেন দেখছি।

গৃহস্বামী নন্দবাবু পাশেই একখানি সোফায় বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া পরশুরামের কথা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ মিষ্টার সেনের কথায় বাধা পড়ায় ঈষৎ বিরক্তির সুরে কহিলেন: গল্প নয়, হুবহু সত্যি,—আপনি বলুন পরশুরামবাবু।

পরশুরাম কহিল: তারপর আলিপুরের এই ঘোড়ার ব্যারাক থেকে ঘাসের সন্ধানে বেরুলো দলে দলে ঘোড়-সওয়ার ঘেসেড়া পল্টন। এক এক দলের ওপরে এক একজন ক্যাপ্টেন, তাদের টাইটেল ছিল—হাবিলদার। এক এক ঘোড়ায় এক একজন ঘেসেড়া, সবাই বিদেশী, বেশীর ভাগই জাতে তেলেঙ্গা, কালো কুচকুচে চেহারা, মাথায় খাঁকি রঙের পাগড়ী, গায়ে ঢিলে মেরজাই, পরণে খাটো প্যাণ্ট, চোখগুলো পাকা করমচার মত কালচে লাল। ঘোড়ার পীঠে এক একটা লম্বা লাঠি আর তার সঙ্গে দুটো করে চটের থলে জড়িয়ে বাঁধা। উদ্দেশ্য,

ঘাস শিকার করা হ'লে, জোড়াখোলের ভরে ঘোড়ার পিঠে দু দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে, আর যদি তাদের শিকরে কেউ বাধা দিতে আসে, তখন এই লাঠির সদ্ব্যবহার করবে। এই রকম পঁচিশ-ত্রিশ জন বিচিত্র রকমের ঘেসেড়ার উপবওয়ালা হয়ে পিছনে থাকেন যিনি—তিনিই হাবিলদার। তাঁর পোষাকপরিচ্ছদ পদমর্য্যাদা অনুসারে অপেক্ষাকৃত উঁচু ধরণের। মাথায় চুড়োওয়ালা মোগলাই টুপী, তার চারদিক্ রঙিন সাফা দিয়ে জড়ানো, গায়ে আঙ্গরাখা—সদরী, পরণে গোড়ালী পর্য্যন্ত লম্বা টাইট ইজের, কোমরে খাপে-বাঁধা লম্বা তলোয়ার ও কোমরবন্ধে রিভলভার।

সকাল হ'তে না হ'তেই আলিপুরের ব্যারাক থেকে এই রকম বিশ-পঁচিশটি দল ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তা ধ'রে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী পতিত জমির ঘাস শিকার করতে বেরোয়, আর সন্ধ্যার পর সারা রাস্তা কাঁপিয়ে বিজয়-উল্লাসে সবাই ব্যারাকে ফেরে। ব্যারাক শুদ্ধ সকলেই অবাক্ হয়ে দেখে, ঘাসের সঙ্গে আরো কত কি—নানা রকমের ফল ও ক্ষেতের ফসল সহযে যে সব একান্ত দুর্লভ! পল্টনী-বুদ্ধি তখন সহজেই স্থির করে নিল যে, বাঙলার পড়ো জমিতে খালি ঘাসই গজায় না, সরকারের দপদপায় তার ভেতর আরও কত কি ফলে। কাজেই, এই নতুন য্যাডভেঞ্চারে সারা ব্যারাকটাই মেতে উঠলো, আর সমস্ত দক্ষিণ-বাঙলা জুড়ে শুরু হ'ল চাষীদের হাহাকার।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই সকলে এ আখ্যান শুনিতেছিলেন, এই সময়ে দলের ভিতর হইতে বিস্ময়ের সুরে এক মহিলা প্রশ্ন করিল: কেন?

গোটা মানুষ

পরশুরাম কহিল: সেইটুকুই এবার বলছি; কেননা সেই সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে আমাদের আসল কথাটা—একটা চাপা পরিচয়।
হ্যাঁ, আগের কথাটাই শেষ করি। গোড়াতেই বলেছি, সরকার পতিত জমির কথা জানিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন। সরকারের নির্দেশমত এর ব্যবস্থা করবার কর্তারা হুকুম দিলেন, যে-সব জমি পতিত হয়ে আছে, জমিদার বা প্রজা কারুর দখলে নেই, সে সমস্তই সরকারী জমি, সেখানে শুধু ঘাসই জন্মায়। সেই ঘাস কাটবার ব্যবস্থা করা হোক। সরকারী ব্যবস্থার ভার পড়লো, বিদেশী হাবিলদারের হাতে, ঘোড়া সাজিয়ে জঙ্গী ঘেসেডার দল নিয়ে তিনি বেরুলেন—সরকারী পতিত জমির সন্ধানে। এদিকে ডায়মণ্ডহারবারের পথে বেহালা, ওদিকে বজবজের পথে জিনজিরের পুল পার হয়েই হাবিলদাররা এক নজরেই দেখে নিলেন—সরকারী রাস্তার দু'ধারেই বরাবর জমি পড়ে রয়েছে, আর তাদের বুক জুড়ে সবুজ রঙের কি সুন্দর কচি কচি ঘাসের রাশি বাতাসের তালে তালে ঢেউয়ের মত দুলছে!

হাবিলদার সাহেব তখনই ঘোড়া থামিয়ে মিলিটারী কায়দায় হুকুম দিলেন: সবুর?

পঁচিশটা ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গেই চুপ, যেন পুতুল। এবার হুকুম হ'ল ঘোড়া থেকে নামবার, আর চটপট সামনের সবুজ জমিনটা বেবাক খালি করবার। অমনই পঁচিশ জন ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তার ধারের খাদ পেরিয়ে ক্ষেতের ওপর গিয়ে পড়লো। ঘাস কাটা সুরু হয়ে গেল।

একটু পরেই খবর পেয়ে গ্রামের চাষারা উর্দ্ধশ্বাসে অকুস্থলে এসে উপস্থিত! একদল অচেনা অজানা বিদেশী লোকের কাণ্ড দেখে তাদের

গোটা মানুষ

চোখের সামনে থেকে বুঝি দুনিয়ার আলো নিবে গেলো! বৈশাখে প্রথম বর্ষণে ক্ষেতের কর্কশ মাটি কোমল হ'তেই তারা এবার তাড়াতাড়ি জমির পাট সেরে বীজ ধান ছড়িয়েছিল, ভগবান তাদের পরিশ্রম সার্থক করেছিলেন; ক্ষেত ঢেকে আমনের চারাগুলি কিলবিল করে মাথা তুলে হাওয়ার সঙ্গে খেলা দিচ্ছে, দেখলেই অতি বড় পাষাণের প্রাণও আনন্দে নেচে ওঠে। আর এই অমানুষগুলো কিনা এমন ভরা-ক্ষেতের ওপর প'ড়ে চারাগুলো রাক্ষসের প্রবৃত্তি নিয়ে দু'হাতে ছিঁড়ছে।

বিস্ময়ের ভাব কাটাতেই তারা প্রতিবাদ করে উঠল: এ কি করছো, তোমরা কি মানুষ?

আগেই বলেছি, এরা খালি থলে হাতে নিয়েই আসেনি, লাঠিও এনেছিল সঙ্গে। গ্রামবাসিদের উত্তরে সবাই একই তালে লাঠি তুলে জানিয়ে দিলে যে, তারা সত্যিই মানুষ—নতুন ধরণের বেয়াড়া মানুষ!

এ-দলের হাবিলদার সাহেব রাস্তার ধারে একটা পাকুড় গাছের তলায় বিছানো ফরাসে ব'সে ব'সে বোধ হয় ভাবছিলেন—কাছেই ঘাসের বাগান থাকতে কর্তারা ভেবে অস্থির হয়েছিলেন কেন?

গোলযোগে তাঁর ভাবনাটুকু ভেঙ্গে গেল; অবস্থা বুঝে তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং সামরিক কায়দায় খাপ থেকে খপ করে লম্বা তলোয়ারখানা খুলে জনতার দিকে চেয়ে হুমকী দিলেন,—খবরদার!

গ্রামবাসী চাষারা তখন প্রতিকারের আশায় জমিদারের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়লো। জমিদার সব শুনে সরেজমিনে তদারক করতে এলেন। অকুস্থলের অবস্থা দেখে তাঁরও চক্ষুস্থির। কিন্তু হাবিলদার সাহেব

হাকিমের ভঙ্গীতে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—এ সব জমিন সরকারী পতিত. সরকারের হুকুম হয়েছে জমি থেকে ঘাস কাটবার।

জমিদার জানালেন: এ সব জমি সরকারের পতিত নয়, বিলকুল জমাবন্দী, প্রজারা বন্দোবস্ত করে খাজনা দাখিল ক'রে থাকে। আর, তোমার লোকেরা ঘাস ব'লে যা কাটছে, সে ত ঘাস নয়—ধান। মানুষ হয়ে মানুষের এমন লোকসান কেউ কখনও করে?

হাবিলদার কথাটা তুড়িতে উড়িয়ে হুমকী দিলেন—যাও, দাওয়া কর।

একটা স্থানের কথাই বললুম, এমন ঘটনা নানাস্থানেই ঘটতে লাগলো। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। অনেক জায়গায় সংঘর্ষও বাধলো, কিন্তু তার ফল শেষে আরও সংঘাতিক হয়ে দাঁড়ালো। কোন জায়গায় প্রথম দিন বাধা পেলে, আর, গ্রামের লোক সংখ্যায় পুষ্ট দেখলে পরদিনই তিন চারটি দল ব্যারাক থেকে বেরিয়ে সে গ্রামে গিয়ে পড়তো, সেদিন শুধু ঘাস কেটেই তারা গ্রামকে রেহাই দিত না, গ্রামের ভেতর ঢুকে এমন সব অত্যাচার করতো—ডাকাতির চেয়েও কোন অংশে সেগুলো কম ছিল না। এর ফলে সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলেই একটা রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদারের তরফ থেকে মামলা রুজু হ'ল, পুলিসে খবর গেল, কিন্তু ঘাসকাটা আর বন্ধ হ'ল না।

এদিকে ঘেসেড়াদের সাহস দিন দিনই বাড়ছিল। ক্রমশঃই তারা নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বার করছিল। পীরাখলি দক্ষিণের একটা চাষীপ্রধান মৌজা, এক লাগোয়া পাশাপাশি কয়েকখানা গ্রাম, বাসিন্দারা সবাই চাষী, আর জাতিতে পোদ—

সমবেতগণের অধিকাংশেরই মুখে ও চোখে এ কথায় চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা গেল! পরশুরামও এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। কিন্তু সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিল: পরিচয়টা ঘুরিয়ে বললে সত্যের অপলাপ করা হবে, কিন্তু যাদের কথা আমি বলছি, তারা নিজেদের 'পোদ' ব'লেই পরিচয় দিত, কোনো দলিল-দস্তাবেজে জাতির কথায় ওটা বিশুদ্ধ করে লেখাত—'পদ্মরাজ'। পেশার সম্বন্ধেও জানাত—চাষ-বাসই তাদের উপজীবিকা। এই নিয়েই তারা হাসি-খুসির সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু নিয়তি শেষে বাদ সাধলো, সরকারী পল্টনের ঘাসের চাহিদা এদেরও অতিষ্ঠ করে তুললো।

এই মৌজাখানার মুরুব্বী ছিল এক বুড়ো, পদবী তার মোড়ল, কাজেও ছিল তাই; এমন কারুর সাধ্য ছিল না, তার কথাটি কেউ নড়চড় করে বা তাকে না জানিয়ে কেউ কোনো বিষয়ে হাত দেয়। শুধু বয়সে নয়, আর সব বিষয়েই সে ছিল সবার বড়। ঘর-বাড়ী, পয়সাকড়ি, জমি-জেরাৎ, মান-সম্ভ্রম কিছুরই তার অভাব ছিল না। ধানে-ভরা পাঁচসাতটা মরাই, খেত-খামার, ফসল-সজোনো বাগান সব দিক্ দিয়েই তার কি বাড়বাড়ন্তই ছিল।

মিঃ সেন এই সময় প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে কহিলেন: বাঃ, একেবারে আদর্শ পল্লী-চিত্র,—বিউটিফুল! মিষ্টার পরশুরামের বলবার ষ্টাইলটাও চমৎকার!

আর একজন আগ্রহসহকারে প্রশ্ন করিলেন: তারপর কি হল?

পরশুরাম কহিল: এবার সেই কথাই ব'লব—পল্টনী ঘেষেড়াদের উপদ্রব বেড়েই চলেছিল। শেষে একদিন পীরখালির পীঠেও তাদের

গোটা মানুষ

অনাচারের চাবুক এসে পড়ল। ঘেসেড়ার দল এ-অঞ্চলে এসে প্রথমেই দেখলো, গাছের মাথায় কলসী ঝুলছে। খেজুর গাছের সঙ্গে কলসীর কি মধুর সম্বন্ধ—সে রহস্যটুকু হাবিলদার সাহেবের অজানা থাকলেও আর সকলেই মর্মে মর্মে জানতো। সুতরাং প্রথম দিনেই এ-অঞ্চলের অভিধানে এ-দলের লক্ষ্য হ'ল ক্ষেতের ঘাস ছেড়ে গাছের কলসীগুলি পেড়ে আনন্দ করা। যেমন ইচ্ছা, অমনি কাজ: রহস্যের তথ্যটুকু শুনে হাবিলদার সাহেবও তাদের ইচ্ছায় সায় দিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় মোড়লের চণ্ডীমণ্ডপে পীরখালি মৌজার বাসিন্দারা জমায়েত হয়ে মোড়লকে জানালো: এ পর্য্যন্ত আবগারীর দারোগাও তাদের তাড়ি-কাটা বন্ধ করতে পারেনি, খেজুর গাছের রসটুকুর জন্যই তারা উদয়াস্তকাল বুক-পুরে জমির সঙ্গে বোঝাপড়া করে, আজ কিনা ভিন্‌দেশী এসে তাদের মুখের খোরাক ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে যায়! এ যেন সেই—'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই'—এর বিহিত তুমি কর মোড়ল!

মোড়ল বললো: ভালই হয়েছে! খেজুর গাছগুলো আজ খেত-খামার আর ফসল সব বাঁচিয়ে দিয়েছে।

পল্লীর এক যুবক বললে: হালাদের নেশা হয়েছিল তাই রক্ষে, ধান ক্ষেতে না প'ড়ে উলুচড়ার উলুগুলো ঘাস ভেবে হেঁটে নিয়ে গেল বোঝা বেঁধে। কিন্তু রসের লোভ যখন পেয়েছে, সুমুন্দীরা কালই আবার এসে জুটেছে দেখে নিও।

মোড়ল মুরুব্বী চালে বললো: ছ্যাথ, সবাই ঐ ঘেসেড়াদের ভয়ে জড়সড়; বাপ পিতেমোর মুখে শুনিছি, নবাবী আমলে বর্গী এলে

গেরামশুদ্ধ সবাই এমনি ভোড়কে যেত', এ তো কি? তখনকার কালে পাড়ার ঝি-বউরা কেলে হঁ'ড়ির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে পুকুরের জলে পড়ে ইজ্জত বাঁচাতো।

দলের একজন প্রবীণ বললো: যে রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দেখনা, আবার ঝি-বউদের ঐ রকম করেই মান ইজ্জত বাঁচাতে হবে। আমরা চাষাভূষো, তাই গেরামে টেঁকে আছি, সন্ধান নিয়ে দেখো, আর আর গেরামের লেকাপড়া জানা ভদ্দররা সবাই মাগ-ছেলে নিয়ে ভীটেমাটি ছেড়ে সহরে পেলিয়ে গেচে। আর এমনি তাজ্জব, সরকারও চুপ করে আছে, সেপাইগুলোকে মানা করছে না।

মোড়ল এবার দুই চোখ পাকিয়ে জোর গলায় বললে, সরকারের দায় পড়েছে মানা করবার, ওরা ত মজা দেখছে! জেনেছে, চব্বিশ পরগণার চাষারা মানুষই নয়—মেড়ার সামিল, মানুষ হলে এ রকম ক'রে সয়?

একসঙ্গে তখন একশো গলায় প্রশ্ন উঠলো: কি বললে মোড়ল?

মোড়ল গলায় আরও জোর দিয়ে বললো: ঠিক কথাই বলেছি। বুকের পাটায় তোদের সত্যিকারের জোর যদি থাকে, এগিয়ে আয়, ওপরের দিকে চেয়ে বল্—তোরা যে আর-সব গেরামের বাসিন্দাদের মত মেড়া ন'স, মানুষ—সেটা দেশশুদ্ধ সবাইকে জানিয়ে দিবি কাজে?

তখন যে যেখানে ছিল, সবাই বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো, প্রত্যেকের চোখ দিয়ে যেন আগুনের শিখা ফুটে বেরুলো, মুখগুলো ভীমরুলের চাকের মত যেন ফুলে উঠলো উত্তেজনায়, আকাশের দিকে মাথা তুলে সবাই জানিয়ে দিলে: রাজী আমরা রাজী; তুমি শুধু হুকুম দাও।

মোড়ল এবার গম্ভীর হয়ে বললো : চুপ! মুখের কাণ্ড এইখানেই খতম, এবার সুরু করতে হবে যে কাজ,তার হদিস দেবে এই বুড়োর মাথা আর তামিল করবে তোদের মত যোয়ানদের হিম্মত ; তবে এটা ঠিক, আর যাই হোক, ঐ ঘাসকাটা বন্ধ হবে এই পীরখালি থেকেই।

পরদিন পরমোৎসাহেই সেই ঘোড়সওয়ারের দল আবার এই গ্রামেই এসে ঢুকলো। এ অঞ্চলের খেজুরের গাছগুলির মাথায় বাঁধা কলসী সুন্দরীর মাথার খোঁপার মতনই এদের বুঝি আকর্ষণ করছিল! যথাস্থানে হাবিলদারের বিছানা আগেই পড়েছিল, খোস-মেজাজেই তিনি হুকুম দিলেন : আগাড়ী নেশা উতারো, পিছাড়ী কামে লাগো।

ঘেসেড়া হলেও এরা পল্টনের পিছু পিছু ফেরে, সুতরাং পল্টনী হাল চালে এরা রীতিমত অভ্যস্ত। একটা ক'রে লোটা লাঠির মতই এদের সাথী। সুতরাং কলসীর সুরা পান করবার কোনও অসুবিধাই কারুর হ'ল না—ঘণ্টাখানেক ধরে পান-পর্ব্ব চললো। কিন্তু তার পরেই ঘটনার স্রোত অন্য দিকে গড়িয়ে গেল! হাবিলদার সাহেব থেকে ত্রিশ জন ঘেসেড়া প্রত্যেকেই বেহুঁস হয়ে নেতিয়ে পড়ল।

এই দিন সন্ধ্যার পর অনেকেই অবাক হয়ে দেখেছিল, সারিবন্দী একত্রিশটি ঘোড়া আলিপুরের পথ ধরে কদমে কদমে চলেছে—প্রত্যেক ঘোড়ার পিঠে বোঝা আছে কিন্তু সওয়ারী নেই। গ্রামের লোক ভেবেছিলো সেপাইদের এ একটা নতুন কিছু চাল।

পল্টনের শিক্ষিত ঘোড়া, পরিচিত পথেই তারা আলিপুরের ব্যারাকে একটি একটি করে ঢুকলো। শান্ত্রীরা ভাবলো, ব্যাপার কি! ঘোড়ার পিঠে সওয়ারী নেই কেন? ঘোড়াগুলির ভঙ্গীও ত ভাল

নয়! তখনই তাদের পিঠ থেকে ঘাসের বস্তাগুলো নামিয়ে খোলা হ'ল। কি সর্ব্বনাশ! বস্তার ভেতর ঘাসের সঙ্গে এক একটা সওয়ারীর মৃতদেহ ভেঙ্গে দুমড়ে মোরব্বা করে বাঁধা।

তখনই সারা ব্যারাকে হৈ চৈ পড়ে গেল, খবর পেয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ছুটে এলেন; তোড়জোড় নিয়ে মিলিটারী সার্জ্জন এসে দেহগুলো পরীক্ষা করলেন। প্রত্যেক বোঝার মধ্যে ঘেসেড়াদের লোটাও ছিল। সে-গুলোর ভিতর থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিলো। লোটাগুলোর তলায় যে পানীয়াংশ চর্ব্বীর মত বসেছিল—সব একত্র করে পরীক্ষা করা হল। তাতে জানা গেল,তাড়ির সঙ্গে ধুতুরার ফলের রস-সংযোগে একটা বিষের সৃষ্টি হয়েছে।

এর পর সুরু হ'ল তদন্ত,—দ'লে দলে গোয়েন্দা বেরুলো। তারপর পল্টনী অনাচার, লোকের আপত্তি, ব্যাপক অশান্তি—উত্থাপিত মামলা সম্পর্কে—সমস্তই যেন এই ঘটনাকে সরকারের চোখের ওপর উঁচু করে তুলে ধরলো। এর ফলে সরকারী পতিত থেকে ঘাস কাটার হুকুম তুলে নেওয়া হল। কিন্তু যারা এর উপলক্ষ হয়েছিল—তারা আইনের হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায়নি। অনেকের ফাঁসী হয়েছে, অনেকে পুলিপোলাও গেছে। আর মামলার খরচে তাদের যথাসর্ব্বস্বই নিঃশেষ হয়েছে। এক পাকা গোয়েন্দা ঐ মোড়লের বাড়ীতে সন্ন্যাসী অতিথির বেশে আশ্রয় নেয়, আর কথার কৌশলে একটা ছোট সূত্র ধরে সবাইকে ধরিয়ে দেয়। সেই মোড়লের নাতি এই হতভাগা ছোক্‌রা, যে আজ একটা পয়সার জন্যে রায় সাহেবের গাড়ী ঘেঁসে হাত পেতেছিল!

গোটা মানুষ

নন্দবাবু কহিলেন : ওঁর নিজেরই যে সোণার কারবারও আছে, তা বুঝি তুমি জান না মা-লক্ষ্মী ? সুবর্ণ-ভাণ্ডারের নাম শোন নি—ইনিই তার মালিক !

মাধুরী হার-ছড়াটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল : বেশ জিনিসটি হয়েছে.—এত সূক্ষ্ম জিনিসের এমন সুন্দর ডিজাইন—

নন্দবাবু কহিলেন : ডিজাইনটীও নিশ্চয়ই পরশুরাম বাবুর নিজের হাতের। খোকার গায়ে যে গয়নাগুলি দেখছ, উনি নিজেই ওদের ডিজাইন করে দিয়েছেন।

হারছড়াটীর উপর হইতে দুই চক্ষু তুলিয়া মাধুরী অদূরে দণ্ডায়মান পরশুরামের দিকে পুনরায় চাহিল, তাহাতে বিস্ময় অথবা প্রশংসা কোন্‌টি অধিকতর ব্যক্ত হইতেছিল, সে তথ্য কেহ নির্ণয় করিল কি ?

পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা নিশ্বাস তাহার নাকের ছিদ্র দুটী দিয়া চিন্তার সহিত বাহির হইয়া গেল,—ঠিক এই রকমই একটা ডিজাইন আমিও এঁকেছিলুম, আশ্চর্য্য সাদৃশ্য !

গৃহস্বামীর দিকে চাহিয়া পরশুরাম কহিল : তা'হলে অনুমতি হোক্, আমরা আসি !

নন্দবাবু কহিলেন : আপনি কাজের লোক, কতক্ষণ আর আটকে রাখব ! কিন্তু আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

মিষ্টার সেন এই সময়ে কহিলেন : আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যই ভারী খুসী হয়েছি পরশুরামবাবু, ভাল কথা, আপনার পদবীটা—

পরশুরাম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল : আমার পদবী হচ্ছে—পর্ব্বত।

আর জাতের কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় ত কুণ্ঠিত হচ্ছেন, কিন্তু তাও বল্‌ছি—

পরশুরাম পুনরায় সোফাটির কাছে ফিরিয়া গিয়া তাহারই এদিনের সঙ্গী ছেলেটিকে প্রায় কোলের কাছে টানিয়া কহিল : এরই স্বজাতি আমি, অর্থাৎ আমিও পোদ বা পদ্মরাজ, কিন্তু এর জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি।

পরশুরামের এই পরিচয় আর এক দফা নূতন করিয়া বুঝি অনেককেই স্তব্ধ ও চমৎকৃত করিয়া দিল। মিস্ মাধুরীও তাহার পিতার সহিত প্রায় একই সঙ্গে এই ছেলেটির দিকে আর একবার চাহিল।

নন্দবাবু বিস্ময়ের প্রভাবটুকু কাটাইয়া উল্লাসের সুরে কহিলেন : আশ্চর্য্য, আপনি যে আমাদেরই, এ কথা কোন দিন ত বলেন নি!

পরশুরাম কহিল : আপনিও ত জিজ্ঞাসা করেন নি স্যর! আপনি আমার পেশার কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জাতের কথা জান্‌তে চান নি।

নন্দবাবু কহিলেন : কি করি বলুন, আজকালকার ছেলেদের ওটা জিজ্ঞাসা করলেই চটে যায়।

পরশুরাম হাসিয়া কহিল : কিন্তু সবাই যে এক ক্ষুরে মাথা মুড়োয়, এটা সাব্যস্ত করাও ঠিক নয়। যাহোক্, আর একদিন এসে আলাপ করব, চল হে বিপিন—

নন্দবাবু প্রশ্ন করিলেন : এর নাম বুঝি বিপিন?

পরশুরাম উত্তর দিল : আজ্ঞে হাঁ।

গোটা মানুষ

ইতিমধ্যে অদূরে পিতাপুত্রীর মধ্যে কি একটা আলোচনা হইতেছিল। রায় সাহেব এই সময়ে ব্যস্তভাবে উঠিয়া কহিলেন: আমার একটা প্রার্থনা আছে পরশুরাম তোমার কাছে—

সবিস্ময়ে পরশুরাম এই দাম্ভিক মানুষটির দিকে ফিরিয়া চাহিল,—দেখিল, তাঁহার মুখের উপর হইতে কাঠিন্যের সে আবরণটুকু নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, ভঙ্গী অপূর্ব্ব শান্ত।

রায় সাহেব কহিলেন: আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে, আজ হয় ত তোমার মতই হ'ত; সেই ভেবেই 'তুমি' বলে তোমার সঙ্গে আলাপ করছি।

পরশুরাম কহিল: আমি এতে ভারি খুসী হয়েছি, আরও খুসী হব, এর পর নন্দবাবুও যদি আমাকে তুমি ব'লেই কথা বলেন।

নন্দবাবু হাসিমুখে কহিলেন: বেশ তাই হবে পরশুরাম।

রায় সাহেব এবার কণ্ঠের স্বর অতিশয় গাঢ় করিয়া কহিলেন: এই মেয়েটিকে নিয়েই আমার সংসার, ছেলেপুলে কেউ নেই, ছেলের অভাবে মেয়েটাকেই ছেলের মত যত্নে লেখাপড়া শিখাচ্ছি। এখন, তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা বাবা, বিপিনকে আমার হাতে দাও, আমি একে ছেলের মত করে—

পরশুরামকে বুঝি এই প্রথম বিচলিত হইতে দেখা গেল। রায় সাহেবের মুখের কথাটা ঠিক এই স্থানে কণ্ঠের গাঢ়তায় হঠাৎ স্তব্ধ হওয়ামাত্রই সে খপ্ করিয়া কহিল: কিন্তু—

পরক্ষণেই রায় সাহেব পরশুরামের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন: এতে আর কিন্তু নেই বাবা, তোমার কথা আর এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার

আমাকে আজ আবার গত তিরিশ বছরের সীমানায় পিছিয়ে নিয়ে গেছে। আমার বাবার মুখে শুনেছি, তিনি পীরখালির মামার বাড়ী থেকে মানুষ হয়েছিলেন; এই ছেলেটিকে বুকে করে' আমি করব— পীরখালির প্রায়শ্চিত্ত।

পরশুরাম কহিল : এর ওপর আর কথা নেই, স্যর। পথে একটা পয়সা ভিক্ষা চেয়েছিল ব'লে, আপনি এই ছোকরাকে পুলিসে দিতে চেয়েছিলেন, আর এখন বুকে তুলে নিতে চাইছেন, প্রায়শ্চিত্ত আপনার এইখানেই হয়েছে।

পাঁচ

পরশুরাম যে বংশের ছেলে, বংশগত কোন প্রসিদ্ধি বা প্রতিষ্ঠা তাহার না থাকিলেও, বৈশিষ্ট্য একটা ছিল। সেটি হইতেছে—স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠা। ইহাদের কুরচিনামা ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে—এই বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে অধস্তন বংশধর—পরশুরামের পিতা পুঁটিরাম পর্য্যন্ত কেহ কদাচ দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। অনেকেই হয়তো এজন্য কষ্ট অনেক পাইয়াছে,অভাবের জ্বালা-যন্ত্রণাও প্রচুর পরিমাণে সহিয়াছে, তথাপি বাঁধা মাহিনার চাকুরীর প্রলোভন কিছুতেই ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

যে গ্রামাঞ্চলে ইহাদের বাস্তুভিটা, পুরুষানুক্রমে যেখানে বসবাস করিয়া আসিতেছিল, তাহা আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত এবং সহর কলিকাতার

সম্পর্কে দূরত্বের ব্যবধান মাইল বারোর অধিক না হইলেও—এই অঞ্চলের বাসীন্দাদিগকে সহর হইতে আড়াইশো মাইল তফাতের গাঁইয়াদের মতই বহু বিষয়ে অনভিজ্ঞ, প্রগতি-সম্পর্কে উদাসীন এবং অন্যের অনুকরণে বীতস্পৃহ দেখা যাইত।

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরশুরামও দেখিয়াছে—সারা গ্রামখানা সে সময় যেন পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বাঁধাধরা রুটিনের মতই চলিতেছে। একটু এদিক-ওদিক হইবার জো নাই। সকাল হইলেই ছেলেরা হাত মুখ ধুইয়া কোঁচড়-ভরা মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে পাঠশালায় ছোটে, 'জলপানি'-বেলা হইলেই বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া ঘণ্টা কয়েক বিশ্রামের পর পুনরায় পাঠশালায় যায় হাজিরা দিতে। বৈকালে ছুটির পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দল বাঁধিয়া খেলার কি ধুম-ধড়াক্কা তাহাদের!

এদিকে বাড়ীর বড়োরা খেত-খামারে গিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কি খাটুনিই খাটে! জলপানি বেলায় স্নানাহারের ছুটি পাইয়া ছেলেরা পাঠশালা হইতে ফিরিবার পথে প্রত্যহই দেখে—ক্ষেতের ধারে আইলের উপর উবু হইয়া বসিয়া কি তৃপ্তির সঙ্গেই তাহারা 'জলপান' করিতেছে। ধামাভরা মুড়ি, ভিজা ছোলা, আর আখের গুড় হইতেছে তাহাদের এই জলযোগের উপাদান। ইহার পর তাহারা আবার নূতন উদ্যমে আরও ঘণ্টা দুই খাটিবে—যতক্ষণ না কলের 'ভেঁা'র পরিচিত আওয়াজটি চেতাইয়া দিবে—দুপুরে যে বাজলো, এবার ওঠো!

তৃতীয় প্রহরে পাঠশালায় যাইবার সময় ছেলেরা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে—তাহাদের আগেই অভিভাবকেরা বৈকালী কাজে লাগিয়া গিয়াছে এবং সূর্য্যিঠাকুর পাটে না-বসা পর্য্যন্ত ইহাদের কাজ চলিবে।

গোটা মানুষ

প্রত্যেক সংসারে মেয়েদের কাজের ধারাও এমনই কলের মত চলে। যাহারা সধবা বা বধূ তাহারা ঘরে বসিয়া গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম ত করিবেই, কিন্তু সে-সব কাজ সারিয়াও তাহারা উপরি এমন অনেক কাজ খুঁজিয়া-পাতিয়া লয়—যাহাতে সংসারে সুসার হয় এবং সময় সময় তাহা হইতে কিছু না কিছু অর্থাগমও হইয়া থাকে ; যেমন—ছেঁড়া কাপড়চোপড় দিয়া কাঁথা সিলাই করা, ধুচুনি চুবড়ি ঘুনি চ্যাটাই মাদুর ঝাঁতাল প্রভৃতি বোনা ; নারিকেলপাতা চাঁচিয়া কাটি বাহির করা। আর যাহারা বিধবা, তাহারাও কেহই সংসারের বোঝা বা গৃহস্বামীর গলগ্রহ হইয়া থাকেনা। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের শ্রমশীলতা ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় হয়ত বাহিরের লোকের নিকট সম্ভ্রমহানিকর বলিয়া নিন্দনীয় হইবে, কিন্তু এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে ইহার সমর্থন করিয়া আসিতেছে। এই সকল 'অবীরা' যে দুই মুঠা অন্নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া কিম্বা অন্যান্য অনুন্নত জাতির বিধবাদের মত পরিচারিকার বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে বেসাতী-ব্যাপারে লিপ্ত, ইহাতে তাহারা প্রীত ও গর্ব্বিত! তাই প্রত্যহ দেখা যায়—পল্লীজাত তরিতরকারি সুলভে সংগ্রহ করিয়া ইহারা চলিয়াছে দিব্য সপ্রতিভ-গতিতে সন্নিহিত হাট, বাজার বা গঞ্জে বিক্রয় করিতে এবং বিক্রয়ান্তে গঞ্জের মহাজনদের ধান মাথায় বহিয়া দ্বিপ্রহরে বাড়ী ফিরিতেছে। সারা বিকালটা এই ধানের তদ্বির করিতেই কাটিয়া যায়। ধান-গুলি সাবধানে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সিদ্ধ করিয়া শুখাইয়া তাহার পর ঢেঁকিতে ভানিয়া চাউল তৈয়ারী করিয়া মহাজনের দোকানে যথাসময় বুঝাইয়া দেয় এবং মজুরী হিসাব করিয়া লয়। ধানের ভুষি, কুঁড়া ও চালের

খুদগুলি ইহারা অতিরিক্ত পাইয়া থাকে, তাহাতেও কিছু সংস্থান হয়। দৈহিক শ্রমে লিপ্ত থাকায় ইহাদের দেহগুলি বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপুষ্ট এবং মনও নির্ভীক ও নির্ম্মল থাকিবার সুযোগ পায়। অপরিচিত পুরুষের সংস্রবে আসিলে ইহারা সঙ্কোচে জড়সড় বা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইতে যে পরিমাণে ইহারা উদ্গ্রীব নারীত্বের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও সেই পরিমাণে থাকে সচেতন ও সতর্ক।

সুতরাং এই সকল কারণ-পরম্পরায় এই গ্রামের অধিবাসীরা সভ্যতার অনেকখানি তফাতে থাকিয়াও এই স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠার জন্যে শিক্ষাভিমানী বহু সভ্য সমাজের আদর্শ ছিল; অন্ততঃ পরশুরামের ধারণাটুকু এইরূপ। এখনও পরশুরামের মানসপটে শৈশবের স্মৃতিরেখাগুলি চিত্রের মত উজ্জ্বল হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয়, সে শুধু জোরে একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলে—হায়রে সে কাল!

গ্রামখানির নাম দৌলতগাছি। যদিও গ্রামবাসীদের ঘর বাড়ী, চাল-চলন বা বেশভুষার বহর দেখিয়া বাহিরের কেহ ধারণাই করিতে পারিত না যে ধন-দৌলতের সহিত ইহাদের কোনরূপ পরিচয় আছে, কিন্তু ইহাদের গৃহস্থালী এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রণালী ভালো করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে বাহিরের লোকের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহারা তখন উপলব্ধি করিতে পারিত মনের মণিকোঠায় সন্তোষের সিন্দুকে যে ধনদৌলত ইহারা ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের কোন ঐশ্বর্য্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। অখ্যাত গ্রাম-অঞ্চল আশ্রয় করিয়া ইহারাই বুঝি অতীত বাঙ্গলার আদর্শটুকু এখনও প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে।

অতিথি আসিলে এ অঞ্চল হইতে শুষ্কমুখে কখন ফেরে না, বাড়ীর

কর্ত্তারা হাজির না থাকিলেও, মেয়েরা তাহার যথোচিৎ সৎকার করে; চাল ডাল ঘী তরকারি সাজাইয়া সিধা দেয়, বাহিরের চালায় পাকের বন্দোবস্ত চলে। গ্রামের কেহ বিপদে পড়িলে সকলে মিলিয়া তাহাকে দায় মুক্ত করিতে কোমর বাঁধে। মনের ভুলে যদি কেহ কোনরূপ অন্যায় করিয়া বসে—পদস্খলনও যদি ঘটে,—সে জন্য গ্রাম্য মোড়লের চণ্ডীমণ্ডপে পঞ্চায়েৎ-সভায় তাহার যে মীমাংসা হইয়া যায়, তাহাতে সাপও মরে এবং লাঠিও বাঁচে। অর্থাৎ পাপের খোলসটুকু ছাড়াইয়া লইয়া মানুষটীকে ইহারা আদর করিয়া ঘরে তুলিয়া লয়, কাজেই ইহাদের জাতের পদস্খলিতা মেয়েরা তাড়া খাইয়া বাহিরে গিয়া পাপের বীজ ছড়াইবার বা সমাজের মুখে কালি দিবার কোন ফুরসদই পায় না। আবার বাহিরের কোন আপদ আসিয়া ইহাদিগকে যদি দাবাইবার বা তাঁবেদার করিয়া তুলিবার প্রয়াস পায়, ইহারা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এমন প্রচণ্ড সামাজিক প্রতাপের পরিচয় দেয় যে, বিরোধীপক্ষ সকল রকমে হায়রাণ হইয়া এই 'স্বভাবদুর্ব্বৃত্ত'দের সম্পর্ক ত্যাগ না করিয়া পারে না।

এমনই এক স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল বলিয়া পরশুরাম মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করে। এ-সম্বন্ধে তাহার আরও বেশী রকমের শ্লাঘা এই যে—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জাতির সংস্কৃতিগত ঐশ্বর্য্যের যে প্রদীপটির আলো দেখিয়া সে আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া ওঠে,—কিছুকাল পরে তাহারই চক্ষুর উপরে সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রদীপটি নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে তাহার পিতা কি বিপুল যত্নেই তাহাকে সকল ঝড়-ঝাপটা কাটাইয়া বাঁচাইয়া রাখে—এবং কালক্রমে তাঁহার জীবন-দীপের তৈলটুকু যখন নিঃশেষ

হইয়া আসে, সমাজ-জীবনের সেই অখণ্ড প্রদীপটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার তাহারই উপর চাপাইয়া দিয়া কি তৃপ্তিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন !

এক সময়ে পরশুরামদের অবস্থা খুব ভালো ছিল। গ্রামখানার প্রায় পাঁচ আনা অংশের মালিকই ছিল পরশুরামের পূর্ব্ব-পুরুষরা। কতক জমি জমা দিয়া ও কতক জমিতে চাষ আবাদ করিয়া তাহারা বেশ প্রতিপত্তির সঙ্গেই দিন কাটাইতেছিল। তাহার পর বংশবৃদ্ধির সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারায় বংশধররা ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়ে। তখন পরশুরামের পিতামহ গুইরামের মাথায় চাপে কারবার করিবার বাতিক। গঞ্জে সে বড় রকমের এক আড়ৎ খুলিয়া বসে। কিন্তু এক রাত্রিতে আগুন লাগিয়া সমস্ত গঞ্জ পুড়িয়া যায়, আর সেই সঙ্গে গুইরামও সর্ব্বস্বান্ত হয়। যে জমিজেরাৎ ছিল, মহাজনের দেনা মিটাইতে অধিকাংশই বেহাত হইয়া যায়, শুধু বাস্তুভিটাটুকু কোন রকমে মহাজনের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে নিষ্কৃতি পায়। পরশুরামের পিতামহ তারপর অনেক চেষ্টা করিয়াও আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইতে পারে নাই, ভগ্ন-মনেই তাহাকে অপূর্ণ আশাটুকু ফেলিয়া রাখিয়া পরলোকের পথে পাড়ি দিতে হয়।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিল—বাবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সে পূর্ণ করিবে, বেসাতি করিয়া ভাগ্য ফিরাইবে, তাহাতেই তাহার বাবাকে তুষ্ট করা হইবে, পরলোক হইতে দুই হাত তুলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন কৃতকার্য্য পুত্রকে।

কিন্তু পুঁটীরামের তরুণ জীবনে এই সময় এক 'রোম্যান্স'-এর সৃষ্টি হইল অপ্রত্যাশিত ভাবে। মেটিয়াবুরুজে এক আত্মীয়-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা

করিতে 'গয়া নিয়তি-নির্দ্দেশেই যেন জীবন-সঙ্গিনী প্রাপ্তির সহিত জীবন-পথে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি করিয়া সে ফিরিল। আত্মীয়টি অবস্থাপন্ন, শহরঘেঁসা বলিয়া তাঁহার সংসারে শহরসুলভ সভ্যতার কিছু কিছু আভা পড়িয়াছিল, এমন কি বাড়ীর মেয়েদের মনমুকুরগুলি পর্য্যন্ত শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

ইহাদের সমাজে অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিবার প্রথা পুরুষানুক্রমে চালু থাকায় পাত্রপক্ষের সহিত দর-কষাকষির পর একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া কন্যার পিতা তবে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে রাজী হয়—যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে বর্ণ-হিন্দুদের পুত্র-বিবাহ-ব্যাপারে বিদ্যমান! কন্যার বিবাহে প্রাপ্তি যোগ থাকায়, কন্যারা পিতৃগৃহে আর 'কন্যকা' হইবার অবসর পায় না, সাতে পড়িবার আগেই তাহাদিগকে ছাদনাতলায় সাত পাক ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, কাজেই দশমবর্ষে পড়িয়া 'কন্যকা' হইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে সধবা হইতে হয়।

মেটিয়াবুরুজের সামন্ত মহাশয় তাঁহার ত্রয়োদশী কন্যা দামিনীকে উপলক্ষ করিয়াই বুঝি সমাজপ্রচলিত এই দুইটি প্রথার মূলোচ্ছেদে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। যেখানে যত আত্মীয়কুটুম্ব তাঁহার ছিল, এ বিবাহে সকলেই নিমন্ত্রিত হওয়ায় কুটুম্ব-মহলে রাষ্ট হইয়া পড়িল যে, সামন্ত মহাশয় কন্যাকে ডাগর ডোগর করিয়া বিবাহ দিতেছেন এবং পণ না লইয়া নিজেই ছেলেকে সখ করিয়া সাড়ে বাইশ গণ্ডা টাকা পণ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কথাটা পদ্মরাজ-সমাজে আলোচনার রীতিমত বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

যে পাত্রের সহিত সামন্ত মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা

হইয়াছিল, পাটকলের দৌলতে তাহাদের তখন খুব শ্রীবৃদ্ধির অবস্থা। পাত্রের পিতা দুর্য্যোধন চৌধুরী পাটকলের ব্যাপারে যে-উপায়ে পয়সা উপায় করিত, এবং এই পয়সার জোরে যেরূপ দাপটে বেপরোয়া হইয়া সে চলিতেছিল, সমাজ তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই। ইহাদের সমাজে মুড়ি-মিছরির এক দর—সমাজের ব্যবস্থায় একই ক্ষুরে ছোট-বড় সবাইকে মাথা মুড়াইতে হয়, পয়সার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এখানে নাই। কিন্তু পয়সার গরমে দুর্য্যোধন চৌধুরী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদির দেখাদেখি সমাজকে দাবাইয়া চলিবে সাব্যস্ত করিয়াছিল। এমন কি, পারিবারিক কোন অনাচার সম্পর্কেও সমাজের তোয়াক্কা সে রাখে নাই। সমাজও এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য বলে নাই, বোধ হয় উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চৌধুরী-পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া সেই সুযোগ আসিয়া সমাজকে সচেতন করিয়া দিল। সমাজকে লুকাইয়া সমাজভুক্ত কেহ কিছু অনাচার করিলে এবং সমাজের নিকট ধরা দিয়া ছাড়পত্র না লইলে, সেই অনাচারীর সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় সমাজের 'ষোল-আনা' লোক দলবদ্ধ হইয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে অনাচারীকে রীতিমত খেসারৎ আক্কেল-সেলামী-স্বরূপ ষোল আনার হিতকর কোন সদনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানে দাখিল করিয়া এবং কৃতাপরাধের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া লইতে হয়। তখন সে-লোক পুনরায় ষোল-আনার সহিত মিশিয়া যায় এবং ষোল-আনাও অতীতের সকল কথা ভুলিয়া তাহার অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগ দিতে দ্বিধা করে না।

দুর্য্যোধন চৌধুরীর সম্বন্ধেও সমাজ ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছিল। খুব ঘটা করিয়া বর ও বরযাত্রী-সহ দুর্য্যোধন চৌধুরী ভাবী বৈবাহিক

সামন্ত মহাশয়ের বাড়ীর চত্বরে সামিয়ানাতলে সুসজ্জিত সভায় বসিবা-মাত্রই সমাজের ষোল-আনা 'ঘোঁট' সুরু করিয়া দিল, এবং একজন মাতব্বর মুখপাত্র হইয়া চৌধুরী পরিবারের অনাচারগুলির উল্লেখ করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিল।

ফলে বারুদের স্তূপে যেন আগুনের ফুলকি পড়িল। অখ্যাত অশিক্ষিত অজ্ঞান আহাম্মুখের দল দুর্য্যোধন চৌধুরীর মত পদস্থ গণ্য-মান্য লোকের কাজের বিচার করিতে কৈফিয়ৎ চায়,—এত বড় আস্পর্দ্ধা! পাটকলের জাঁদরেল সায়েবদের চরাইয়া যে লোক পয়সা পয়দা করে, বড় বড় ঘরের পাসকরা ছেলেরা দুটিবেলা যাহার কাছে কাজের উমেদারী চালায়, আজ কিনা তাহার কাজের কৈফিয়ৎ চাহিতে আসিয়াছে—ঘৃণ্য নগণ্য অসভ্য চাষার দল? হইলই বা তাহার স্বজাতি,—কিন্তু সে কি কোনদিন ইহা-দিগকে গ্রাহ্য করিয়াছে? সে ত ইহাদিগকে ডাকে নাই, নিমন্ত্রণও করে নাই—কোন্ সাহসে ইহারা সভায় আসিয়া কৈফিয়ৎ চায়?

ফলতঃ, কুলির সর্দ্দার আজ্ঞাধীন কুলিদিগকে যে দৃষ্টিতে দেখে এবং যেরূপ অমার্জ্জিত ভাষায় তাহাদিগকে তিরস্কার করে, সেইরূপ খরদৃষ্টিতে চাহিয়া, সেইরূপ উদ্ধত ভাবে তর্জ্জনের স্বরে সে শাসাইল সমাজের ষোল-আনাকে!

কিন্তু তাহার ভাবী বৈবাহিক বিচক্ষণ সামন্ত মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে সবিনয়ে জানাইয়া দিলেন,—মেয়ের বিবাহে আমি সমস্ত সমাজকেই নেমন্তন্ন করেছি। বিনা নেমন্তন্নে কেউ এখানে আসেনি। আপনি অমন করে ওঁদের সম্বন্ধে কথা বলবেন না, তাতে ওঁরা অপরাধ নেবেন। আপনি কি জানেন না—দৌলৎগাছি আমাদের সমাজের মাথা, আর

ঘোঁটটা ওঁরাই তুলেছেন। এখন আপনি একটু নরম হলেই ওঁরা ক্ষমা ঘেন্না করে আপনাকে রেহাই দেবেন।

চৌধুরী গর্জ্জন করিয়া কহিল: কি! ক্ষমা ঘেন্না ক'রে রেহাই দেবে দুর্য্যোধন চৌধুরীকে? গোল্লায় যাক তোমার দৌলতগাছি,—যত সব গোঁয়ারগোবিন্দ চাষার গাঁদি—ওদের মাথায় মারি লাথি।

শেষের কথা কয়টি ফরাসের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দুর্য্যোধন চৌধুরী পুরাণের দুর্য্যোধনের মতই সদম্ভে ও সদাপে ব্যক্ত করিল।

দৌলৎগাছির লোকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কন্যা-কর্ত্তা সামন্ত মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল: ওর লাথি আমরা মাথা পেতেই নিলুম; কিন্তু আপনাকে জানিয়ে চললুম সামন্ত মশাই—ওর ঘরে যদি আপনার মেয়ে যায়, আমাদের সমাজে তাহলে আপনার হুঁকো কল্কে বন্ধ হয়ে গেলো জানবেন।

দৌলতগাছির সঙ্গে সঙ্গে বইছে, বাবুগাছি, জৈয়তে, পীরপাছা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রামের মাতব্বরেরাও জানাইয়া দিল,—আমাদেরও এই রায় সামন্ত মশাই!' এর পরে আমরাও আপনার সঙ্গে হুঁকো কল্কের সম্বন্ধ রাখতে পারবো না।

সামন্ত মহাশয় তখন হবু বৈবাহিককে ধরিয়া বসিলেন: মাপ চান ওদের কাছে বেইমশাই, নইলে ভারি কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধবে।

কিন্তু দুর্য্যোধন চৌধুরীর দুর্জ্জয় পণ—মাথা সে কিছুতেই নিচু করিবে না,—যদি সভা হইতে ছেলে তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিতে হয়—তাহাতেও সে পিছপাও নয়।

সামন্ত মহাশয় শেষে শক্ত হইয়া বলিলেন: আপনাকে খুসী করবার

জন্য আমি সমাজ ছাড়তে পারি না, তা ছাড়া, সমাজের যখন কোন দোষই দেখছি না। আপনি শুধু পয়সার গরমে সমাজকে হেনস্থা করছেন, কিন্তু আমার সে সাহস নেই।

দুর্য্যোধন চৌধুরী তথাপি নরম হইল না, সে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল: বেশ! আপনি তাহলে সমাজ নিয়েই থাকুন, আমি ছেলে নিয়ে চল্লুম। এর পরে দেখবেন সমাজের ষোল আনার কি হাল করি!

অতঃপর সে উদ্ধত ভাবে ছেলের হাত ধরিয়া তুলিল এবং তাহার অনুগত অন্তরঙ্গদের দিকে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে হুকুম করিল: উঠে পড় সকলে—চলো।

শত শত স্তব্ধ চক্ষুর উপর দিয়া বর লইয়া দুর্য্যোধন চৌধুরী সদম্ভে চলিয়া গেল। বরযাত্রীদের কতক তাহাদের সঙ্গে গেল, কতক ক'নে যাত্রীদের দলে ভিড়িয়া বলিল: আমরা বরের ঘরের মাসী, আর—ক'নের ঘরের পিসী। কাজেই ফলার শেষ না করে নড়ছি না।

এখন মহাসমস্যা দাঁড়াইল—কি করা যায়! কেমন করিয়া সামন্ত মহাশয়ের জাতকুল রক্ষা হয়? শেষে সমস্যার সমাধান করিতে হইল—পুঁটিরাম পর্ব্বতকে। ষোল আনা তখন ধরিয়া বসিয়া তাহাকে এ বিবাহে রাজী করাইল; পুঁটিরামও বুঝিল, ইহাতে দৌলতগাছির মান বাড়িবে—মুখখানা উঁচু হইয়া উঠিবে। কিন্তু একটি সর্ত্তে সে ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইতে সম্মতি দিল; সর্ত্তটি এই যে, পণের একটি টাকাও সে লইবে না, সামন্ত মহাশয় একান্তই যদি ঐ টাকা দিতে চান, সেই টাকায় দৌলতগাছির পাঠশালাটি ভালো করিয়া মেরামত করিয়া দেওয়া হউক, যেহেতু সেটি ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে।

গোটা মানুষ

সামন্ত মহাশয় সানন্দে ভাবী জামাতার প্রস্তাবে সায় দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে সম্প্রদানস্থলে লইয়া গেলেন।

যে-বর সভা হইতে উঠিয়া গেল, তাহার তুলনায় পুঁটিরাম অবস্থার দিক দিয়া যত খাঁটোই হোক না কেন, চেহারার দিক দিয়া তাহার তুলনায় যেন রাজপুত্র। নূতন বরের স্বাস্থ্য-পুষ্ট সুন্দর চেহারা দেখিয়া কন্যাপক্ষের সকলেই একবাক্যে বলিল: হ্যাঁ, যেমন ডাগর-ডোগর সোন্দোর কনে, তেমনই হয়েছে রাঙাপানা বর! সামন্তর ভাগ্যি ভালো।

বিবাহ শুভলগ্নেই হইয়া গেল এবং পুঁটিরাম বউ লইয়া বাড়ী ফিরিল। ওদিকে দুর্য্যোধন চৌধুরী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, দৌলতগাছির সম্বন্ধে বিবাহ-সভায় সবার সামনে দাঁড়াইয়া যাহা সে বলিয়াছে, কাজেও তাহা না দেখাইয়া ছাড়িবে না, এজন্য যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও মঞ্জুর!

এই বিবাহের পর পুঁটিরামের নাক-ডাক খুব বাড়িয়া গেল। গ্রামের পাঠশালাটির শ্রী ফিরিয়া গেল তাহারই দৌলতে। পুঁটিরামের পড়াশুনাও কিছু ছিল; আর এই গ্রামে, লেখাপড়া-জানা-মেয়েকে, সেইই প্রথম বধূর মর্য্যাদা দিয়া আনায়—এই পরিবারটির মর্য্যাদাও গ্রামের ষোল-আনাকে মানিয়া লইতে হইল। এই সূত্রে—বয়সের দিক দিয়া কাঁচা হইলেও পুঁটিরাম পাকা পাকা মাথাওয়ালা পঞ্চায়েতদের দলে স্থান পাইল, ইহার উপর গ্রাম্য পাঠশালাটি ভালোভাবে চালাইবার ভারটুকুও শেষে তাহারই উপর পড়িল।

দামিনীর সম্বন্ধে পাড়ার মেয়েরা যাহা ভাবিয়াছিল, কাজে কিন্তু তাহার উল্টা হইয়া গেল। বড়লোকের মেয়ে, শহরঘেসা, তার উপর

লিখিয়ে-পড়িয়ে—সে কি এই অজ পাড়াগাঁয়ে ঘরবসত করিতে পারিবে? তার বাপের পাকা দালান, কত চাকর-বাকর; আর এখানে তাকে গতর খাটাইয়া সোয়ামীর ঘর সংসার দেখিতে হইবে—এ সব কি তার মনে ধরিবে?

কিন্তু দামিনীর সম্বন্ধে যাহারা এই সব আলোচনা গোড়ায় গোড়ায় করিয়াছিল, মাস কয়েকের মধ্যেই এই ডাগর-ডোগর বধূটির গতর, বুদ্ধি-ব্যবহার, কাজকর্ম্মের গোছালো ধারা ও আক্কেল-বিবেচনা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহারা বুঝিল, মেয়ে শুধু মাথায় বড় হয় নাই, খালি খালি বই পড়িয়া ডেঁপোমী শিখে নাই, ঘর গৃহস্থালী গুছাইয়া চালাইতে যাহা যাহা আবশ্যক, সেই সমস্তই এই বয়সে এমন ভাবে করিয়া মেয়েটি শিখিয়াছে যে, কোন বিষয়ে কাহারো খুঁৎ ধরিবার জোটি নাই।

এখন গুণবতী বধূ পাইয়া পুঁটিরাম যেন বর্ত্তাইয়া গেল। সে দামিনীর উপর সংসার ছাড়িয়া দিয়া নিজের দোকান লইয়া পড়িল। যদিও প্রতিবেশীরা তাহাকে বার বার বাধা দিয়া বলিয়াছিল—যাতে তোমার বাবা ফতুর হয়ে গেছে, সে কাজে আর মাথা দিয়ো না, তার চেয়ে চাস-বাস করো আমাদের মত, না হয়—একটা চাকরী-বাকরীও যোগাড়-যন্তর করে দেখে শুনে নাও, ভালো হবে। ও কারবা-কারবার তুলে দাও, কিছু ওতে হবে না।

কিন্তু পুঁটিরাম প্রতিবেশীদের এ পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে বলিয়াছিল—চাষের কাজ ত শিখিনি। বাবার সাধ ছিল—এই ব্যবসাতেই মা-লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে আমাদের গাঁয়ের আর জাতের মুখ

দেশের সামনে তুলে ধরবেন। তিনি ত কারবারে লোকসান খাননি, আগুন লেগেই না সব জ্বলে পুড়ে গেল! কিন্তু বাবার আশা ছিল—মা-লক্ষ্মীকে তিনি পালাতে দেবেন না—ধরে আনবেনই। এই আশা সাথে নিয়েই তিনি গেছেন,—আমি বেশ বুঝতে পারচি, আমার পানেই তিনি তাকিয়ে আছেন ওপর থেকে—তাঁর আশা আমি মেটাবো, আমি না পারি—আমার ছেলে মেটাবে।

তখন পুঁটিরামের ছেলে পরশুরামের বয়স ছয় মাসও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু এই ছেলের আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর চেহারা ও বলিষ্ঠ গড়ন দেখিয়া পুঁটিরাম পত্নী দামিনীকে বলিয়াছিল—এই ছেলেই আমাদের দুঃখু ঘোচাবে। পুঁটিরামের এই ছেলেটিকে দেখিয়া পাড়াশুদ্ধ সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছে,—চাষা গরীবের ঘরে রাজপুত্তুরের মত এমন সোন্দর খোকা এর আগে আর কখনো আসেনি। পুঁটিরামের শ্বশুর সামন্ত মহাশয়ই নাতীর নাম রাখেন—পরশুরাম।

পুঁটিরামের মত সচ্চরিত্র ও স্বাবলম্বী পাত্রের হাতে কন্যা দামিনীকে দান করিয়া সামন্ত মহাশয় সুখীই হইয়াছিলেন। এক সময়-যে পুঁটিরামদের অবস্থা ভাল ছিল, শুধু অদৃষ্টবৈগুণ্যে দুর্ঘটনায় তাহাদের জমিজেরাৎ সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার জামাতা পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া ভাগ্য ফিরাইতে ব্রতী হইয়াছে—এ সকল সংবাদও তাঁহার অবিদিত ছিল না। বিবাহের পরই তিনি স্থির করিয়াছিলেন—জামাতার কারবারটি যাহাতে মূলধন পাইয়া শীঘ্রই জাঁকিয়া উঠে, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হইবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুর্য্যোধন

চৌধুরীর চক্রান্তচালিত জালে তিনি এমনভাবে জড়াইয়া পড়িলেন যে, নিজেরই শ্বাস বন্ধের উপক্রম হইল।

বিবাহ রাত্রির সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে দুর্য্যোধন চৌধুরী নানারূপ তোড়জোড় করিয়া প্রথমেই সামন্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মিথ্যা দেনার সম্পর্কে নালিশ রুজু করিয়া, দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইয়া, ফৌজদারী সোপরদ্দ করিয়া ক্রমাগতই সে নিরীহ সামন্ত মহাশয়কে এরূপ নাকাল করিয়া তুলিল যে, তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন।

সামন্ত মহাশয়কে অনেকটা কাহিল করিয়া দুর্য্যোধন চৌধুরীর দৃষ্টি পড়িল অবশেষে দৌলতগাছির উপর। এ-পর্য্যন্ত মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলটিই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল; ইদানীং বজবজ অঞ্চলের দুটি নূতন কলে কুলি ও জুট সরবরাহের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন চৌধুরী পুত্র সর্ব্ববিজয়ের সহিত দৌলতগাছির কাছাকাছি আস্তানা পাতিবার সঙ্কল্প করিল।

দৌলতগাছি অঞ্চলটী বজবজের খুব সন্নিহিত। কিন্তু বজবজের মত কলকারখানাবহুল সমৃদ্ধ শহরের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও এ-পর্য্যন্ত এই গ্রামের বাসীন্দারা কলের ডাকে সাড়া দেয় নাই। তাহারা প্রহরে প্রহরে কলের বাঁশী শুনিয়া নিজেদের কাজের 'টাইম' ঠিক করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেও, কলের চাকুরীতে হাজীর' দিতে কখনো ছুটে নাই,—বরং আমরা কারুর ভৃত্য নই—এই বলিয়া ছেলে-যুবা-বৃদ্ধ সবাই সগর্ব্বে অন্যান্য অঞ্চলের কলের চাকুরিয়াদিগের পানে তাকাইয়া হাসিত। কিন্তু তাহাদের এ গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই অঞ্চল ব্যাপিয়া যে চক্রান্ত-চালিত-জালের ব্যূহ রচিত হইতেছিল—তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই।

গোটা মানুষ

একদিন সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, মেটিয়াবুরুজের দুর্য্যোধন চৌধুরী দৌলতগাছি তালুকের পত্তনী লইয়া জমিদারের সম্মান ও মর্য্যাদা আদায় করিতে গ্রামে আসিতেছে। দৌলতগাছি গ্রামখানি এবং এই গ্রামের লাগোয়া আরও কয়েকখানি গ্রাম লইয়া যে মৌজাখানি কালেক্টারী তৌজীভুক্ত, তাহার জমিদার রায়বাবুরা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় দীর্ঘকালের মিয়াদে তাঁহাদের এই মহলটি দুর্য্যোধন চৌধুরীকে এই সর্ত্তে পত্তনী দিয়াছেন যে, জমিদারের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পত্তনীদার উক্ত জমিদারী ভোগদখল করিবে। সর্ত্তানুসারে রায়বাবুদের পাকা কাছারীবাড়ী ও তৎসংলগ্ন স্থানীয় আবাস-ভবন পত্তনীদারের দখলভুক্ত হইয়াছে।

স্বজাতি ও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এই লোকটির এইরূপ প্রতিষ্ঠার সংবাদটি দৌলতগাছির বাসিন্দাদের কিন্তু প্রীতিপ্রদ হইল না। একে ত লোকটা সমাজচ্যুত হইয়া আছে, আর তাহার মূলে রহিয়াছে এই দৌলতগাছির মাতব্বরদের জিদ ও ধর্ম্মঘট। সে অপমান যে তাহার মনে জাগিয়া আছে—নিরীহ সামন্ত মহাশয়ের প্রতি তাহার আক্রোশ হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। পিশাচের প্রবৃত্তি লইয়া কি হাঙ্গামাই তাহাকে করিয়াছে এবং সে পর্ব্ব শেষ না হইতেই এবার নজর দিয়াছে দৌলতগাছির উপর। এখন তাহাদের কি কর্ত্তব্য—তাহারা কিভাবে এই সমাজদ্রোহীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে?

পাঠশালার প্রাঙ্গণে এ সম্বন্ধে পরামর্শ-সভা বসিল এবং গ্রামের ষোল-আনাই তাহাতে যোগ দিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান ও বিচক্ষণ চাষী—রামকালী মোড়ল বলিল: আমার কথা হচ্ছে, হাঙ্গামা-হুজ্জুতি ক'রে কোন লাভ নেই। পাশার

দান এখন দুর্য্যোধন চৌধুরীর দিকেই পড়েছে, আর পড়তে থাকবে। ও এখন জমিদার, হাতে দেদার পয়সা, পাটকলের হাজারো কুলি ওর তাঁবেদার। কোন দিক দিয়েই আমরা ওর সঙ্গে পেরে উঠবো না; মামলা-মকদ্দমা বাধলে আমরাই ধনে প্রাণে মারা যাবো। কাজেই আইন মেনে সিধে রাস্তা ধরেই আমরা চলবো।

দুঃখীরাম নস্কর বলিল: কিন্তু মোড়ল, যদি ওর মনে এই ইচ্ছেই থাকে যে দৌলতগাছিকে জব্দ করা, তখন আমরা সিধে রাস্তা ধরে, আর আইন মেনে চললে—ও কি চুপ করে থাকবে ভেবেছ? মেটেবুরুজের সামন্ত মশাই ত কোন দিন বাঁকা রাস্তায় পা দেন নি, কিন্তু ঐ চৌধুরীই না তাঁর পায়ে পা দিয়ে হাঙ্গামা বাধাসে!

মণ্ডল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল: সে কথা ঠিক, কিন্তু দেখে নিও, আখেরে সামন্তই জিতবে। ভগবান কাণা নন, তাঁরই দেওয়া ক্ষ্যামতা পেয়ে মানুষ যখন বাড়ে—ধরাকে সরা দেখে, তিনি তখন কাঁদেন। আর সেই বাড়ন্ত মানুষ যখন পড়ন্ত হয়ে কাঁদে, তিনি তখন হাসেন। এখন আমাদের উচিত হচ্ছে—ঠিক পথে চলা। আমরা যদি জমিদারের সেরেস্তায় ঠিক মত খাজনা দাখিল করি, আইনের দিক দিয়ে জমিদারের যা দাবী, তা যদি মেনে নিই—তাহলে কেন গোল বাধবে? এক হাতে কখনো তালি বাজে?

পুঁটিরাম বলিল: আপনার কথা ঠিক। তালি এক হাতে বাজে না। কিন্তু তালি দেবায় লোক যদি মিলে যায়—তখন এমন তালি বাজে যে—কাণে পর্য্যন্ত তালা ধরে যায়। যতক্ষণ আমরা ষোল-আনা এক হয়ে আছি, কোন ভয় নেই আমাদের, চৌধুরী যত বড়লোকই হোক,

কোন ক্ষতি আমাদের করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ভেতরে যদি ভেদ হয়, ষোল আনার একটা পাইও যদি ওর তরফে যায়, তখনই এ বড়াই আমাদের থাকবে না। আজ দৌলতগাছি—এক পাঁজা আখের আঁটি, কারোর সাধ্য নেই জোর করে ভাঙ্গে; কিন্তু এই আঁটি খুলে যদি কোন দিন যায়, সে তখন হাসতে হাসতে পাঁকাটির মত পুট পুট করে ভেঙ্গে দেবে।

পুঁটিরামের কথাগুলি সকলেরই মনে ধরিল; সভার মাতব্বরদিগকে মানিতে হইল—হ্যাঁ, এটা ভাববার মত কথা বটে!

মোড়ল তাহার দীর্ঘ হাতখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিল: লাখো কথার সার কথা বলেছে পুঁটিরাম। পেটে ওর বিদ্যে আছে ত, বিদ্বানের মতই কথা বলেছে। সত্যি কথা, দৌলতগাছি আজ পর্যন্ত যে মাথা তুলে খাড়া হয়ে আছে—সে শুধু এই মিলের জন্যে। কথায় আছে—দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ! যাক্—এখন কি করে আমাদের এই ঐক্য ঠিক থাকে, দৌলতগাছি বরাবর কাছিই থাকে—সেই ব্যবস্থাই এখন করা চাই। আমি বলি কি, পুঁটিরামই বলুক—এর যুক্তি কি, এখন আমাদের কি করা উচিত?

ষোল-আনার সকলেই মোড়লের কথার সমর্থন করিয়া পুঁটিরামের মুখেই যুক্তিটা শুনিতে চাহিল।

পুটিরাম খুব সংক্ষেপে দুটি কথায় তাহার বক্তব্যটুকু সকলকে শুনাইয়া দিল,—আড়াই-শো ঘর চাষী নিয়ে আমাদের এই দৌলতগাছি। আমাদের সংসার, রোজগার সব আলাদা; এসব নিয়েত কোন কথা নেই, কিন্তু আপদ বিপদ কিছু এলেই এই আড়াইশো ঘর মিশে হবে এক ঘর—

এক সংসার। গ্রামকে জব্দ করতে কেউ যদি নালিস দায়ের করে আদালতে, সে নালিস গ্রামের আড়াইশো ঘরের ওপর হয়েছে ভেবে— সবাইকে তৈরী হতে হবে। গোপালকে কেউ যদি অপমান করে, আড়াইশো ঘর তার শোধ নেবার জন্য কোমর বাঁধবে। এই হ'ল আমার আগের কথা। এর পরের কথা হচ্ছে এই—আমাদের গাঁয়ের কাছে ঐ যে শহর জেঁকে উঠেছে—কলকারখানার বাহার তুলে আমাদের ডাকছে, আমরা তাতে সাড়া দেব, দল বেঁধে সেখানে যাবো—কিন্তু ঘুস দিয়ে চাকরী নিতে নয়—ফসল আর তৈরী জিনিসপত্তর বেচে ওখানকার পয়সাগুলো কেঁচে আমাদের ঘরে আনতে। দাস্য আমরা কেউ কোন দিন করবো না। এ যদি আমরা পারি—কোন চৌধুরীই দৌলতগাছিকে দাবাতে পারবে না।

সবাই স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। কিন্তু ষোল-আনার প্রত্যেকের মুখেই উত্তেজনার একটা আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে—চারিদিকে চাহিয়া বয়ঃবৃদ্ধ মোড়ল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সে এবার মুখখানা গম্ভীর করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল: এর ওপর আর কথা নেই। পুঁটিরাম যে রাস্তা দেখালে, ঐ ধরেই আমরা চলবো, তাহলেই বাঁচবো; এখন ষোল-আনার কি রায়—তাই আমি শুনতে চাই।

চারিদিক হইতে দৃঢ় কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল: আমরা রাজী, আমরা রাজী।

সভার সংবাদ যথাসময় দুর্য্যোধন চৌধুরীর কানে গেল। সে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল: তিনটে মাস; এরই ভেতর যদি এক

ক্ষুরে সব ভুষুণ্ডীর মাথা মুড়ুতে না পারি আমার নাম মিছে, পেশা মিছে, হিম্মত মিছে।

কিন্তু তিনমাস কেন, ছয়টি বছর চেষ্টা করিয়া এবং তাহার তূণে যত কিছু বাণ সঞ্চিত ছিল, একটি একটি করিয়া সমস্ত নিক্ষেপ করিয়াও পণ সে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিল না। জলের মত অজস্র টাকা ঢালিয়া, সহর হইতে গুণ্ডা আনাইয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া এবং মামলার উপর মামলা দায়ের করিয়া ইহাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতে যে সব কাণ্ড চালাইল, জমিদারী শাসন করিতে কোন জবরদস্ত জমিদার বোধ হয় এ পর্য্যন্ত এরূপ বিরাট আয়োজন করে নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে—দৌলতগাছির রুই-কাৎলা হইতে চুণোপুটিটি পর্য্যন্ত তখন গাঁতি বাঁধিয়া এক হইয়া গিয়াছে; তাহাদের মুখের বুলি হইয়াছে: 'আমরা ষোল আনা, এ আর ভাঙ্গছে না; সবাই আমরা সবার জন্য; আমরা একলাই একশো,—একশো মিলে আমরা একা!'

ইহাই যাহাদের মূলমন্ত্র,—কাহার সাধ্য তাহাদিগকে জব্দ করে!

ছয় বৎসর পরে হিসাবের খাতা খুলিয়া দুর্য্যোধন চৌধুরী দেখিল, অস্থায়ী একটা জিদের জন্য যে বিপুল অর্থ সে ব্যয় করিয়াছে, উৎসাহ শক্তি সাহস স্বাস্থ্য তিল তিল করিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছে, তাহাতে দীর্ঘস্থায়ী কোন কীর্ত্তি সে অনায়াসেই স্থাপন করিতে পারিত। কিন্তু সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া সে যাহা সঞ্চয় করিয়া গেল—তাহা শুধু তাহার বেদনাদায়ক পরাজয়ের ইতিহাস। কাহিনীর মতই চিরদিন তাহার

বংশের সহিত মিশিয়া থাকিবে। এখন কিসে এই কলঙ্কের দাগ মুছিতে পারা যায়—কি উপায়ে?

ঠিক এই সময়েই পরলোক হইতে এমন অতর্কিতভাবে তাহার উপর নিকাশের তলব আসিল যে, সেই উদ্ভাবিত উপায়টি পুত্র সর্ব্ববিজয়কে জানাইবার অবসরটুকুও মিলিল না।

পুত্র সর্ব্ববিজয় বুঝিয়া দেখিল, ঘটা করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ যথানিয়মে করিতে হইলে, দৌলতগাছির স্বজাতিদের দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং তাহার ফলে হয়ত কৌলিক বিবাদবহ্নির চিহ্নও থাকিবে না। কিন্তু তাহা হইলে ত পিতার প্রতিহিংসা অতৃপ্ত রহিয়া যায়,—এবং বরের আসন হইতে উঠিয়া আসার দিনটি হইতে যে দারুণ বিক্ষোভ পুঁটিরাম ও দামিনীকে কেন্দ্র করিয়া তাহাকে প্রতিবিধিৎসায় ক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও উপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সে অসম্ভব! পিতার বিদ্বেষ ছিল শুধু দৌলতগাছির উপর, কিন্তু তাহার মনের আক্রোশ সেই সঙ্গে সুনির্দ্দিষ্ট অন্য দুটি প্রাণীকে বেষ্টন করিয়া যে অহোরাত্র ঘুরিতেছে! কিছুতেই সে নিরস্ত হইতে পারে না। মানস-পটে সে কল্পনার তুলিতে মনোরম চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে—দৌলতগাছির ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সর্ব্বহারা দামিনীর সহিত বুঝাপড়া করিতেছে,—সমাজের দম্ভ, পিতার অবিচার, পুঁটিরামের স্পর্দ্ধার শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া বিজয়ী সর্ব্ববিজয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া দামিনী যেন আত্মসমর্পণে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। এমন উজ্জ্বল কল্প-চিত্র সে মুছিয়া ফেলিবে? অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্ববিজয় পিতার শ্রাদ্ধে মনোযোগ না

দিয়া দৌলতগাছির শ্রাদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইতে লাগিল ; আত্মীয়স্বজনকে জানাইল : এতেই বাবার ঠিকমত শ্রাদ্ধ হবে ।

কিন্তু দৌলতগাছির শ্রাদ্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বেই দীর্ঘ পাঁচটি বৎসরের মধ্যে সর্ব্ববিজয় সঞ্চিত প্রচুর টাকা এবং জীবনের সুখ স্বাস্থ্য ও উৎসাহের শ্রাদ্ধটা এমন ভাবে শেষ করিয়া ফেলিল যে তাহার নিজের শ্রাদ্ধের দিনটিও ঘনাইয়া আসিল ।

আসন্ন একটা সঙ্গীন মামলার তদ্বির করিতে আসিয়া দৌলতগাছির কাছারী বাড়ীতেই যখন অকস্মাৎ তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল, তাহার মুখে জলবিন্দু দিবার মত কোন পরিজনই নিকটে ছিল না। পুত্র মৃত্যুঞ্জয় বিলাতে শিক্ষাব্রতী, পত্নী সুলেখা অন্যান্য পুত্রকন্যা ও পরিজনদের সহিত বিন্ধ্যাচলে বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছে। সর্ব্ববিজয়ের স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের অবকাশ নাই, দৌলতগাছির শ্রাদ্ধের ব্যাপারেই সে ব্যস্ত । কিন্তু এমনই নিয়তির নির্ব্বন্ধ, অবশেষে সর্ব্ববিজয়ের পরম প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁটিরামকেই সপুত্র অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে মানুষটি সমগ্র দৌলতগাছিকে চূর্ণ করিতে পূর্ণ উদ্যমে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, অবশেষে দৌলতগাছির অধিবাসীরাই অতীতের অপ্রীতিকর অবস্থার উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া শোকপূর্ণ অন্তরে সেই প্রচণ্ড জিদি মানুষটির পারলৌকিক অনুষ্ঠানে শ্মশান যাত্রা করিল।

সর্ব্ববিজয়ের চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকালের অখণ্ড বিবাদবহ্নির অবসান হইল বটে, কিন্তু পুঁটিরাম খতাইয়া দেখিল, স্বগ্রামের মুখ রক্ষা করিবার যে দায়িত্বটুকু সে মাথা পাতিয়া লইয়াছিল, সর্ব্বস্বের বিনিময়ে

কোনপ্রকারে তাহা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে বাপ পিতামহের অতৃপ্ত আশাটুকু অপূর্ণ-ই রহিয়া গিয়াছে, তাহার সম্বিতশূন্য জীবনে তাহা চরিতার্থ করিবার কোন সম্ভাবনাই না২।

চিত্তের এই সংশয়সঙ্কুল অবস্থায় অতর্কিতভাবে যেদিন পুঁটিরামের উপরও লোকান্তর হইতে চিরন্তনী আহ্বান আসিল, পত্নী দামিনী ও পুত্র পরশুরামের দেহপণে তখন সে আহ্বান ব্যর্থ করিবার কি প্রচণ্ড প্রয়াস! মুমূর্ষু পুঁটিরাম সে সময় তৃপ্তিভরে নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল—সংসার-সাধনা তাহার এইখানেই সার্থক হইয়াছে। মহাযাত্রার প্রাক্কালে সে পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—মনের ধোঁকা কেটে গেছে দামিনী, তাঁদের কাছে গিয়ে বলতে পারবো—আর কিছু না পারলেও ছেলেটাকে মানুষ করতে পেরেছি, মানুষের মুখোস-পরা নকল মানুষ নয়—আসল মানুষ। তোমাদের আশা সে মেটাবে।

দামিনী দুই চক্ষুর বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি স্বামীর মুখখানির উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল: কত বড় মানুষ তুমি নিজে, সে ত আমি জানি; তোমার ছেলে কি অমানুষ হতে পারে!

পুঁটিরাম তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানা তুলিয়া বলিল: আর তুমি? নিজের কথা লুকুচ্ছ কেন দামিনী! ছেলে মানুষ হয় শুধু বাপের চেষ্টায় নয়, তার ওপর যে মায়ের হাত কতখানি থাকে—আমাদের ছেলেই তার সাক্ষী দেবে।

পুঁটিরামের সেই ছেলে এই পরশুরাম। পিতৃপুরুষদের অতৃপ্ত আশা চরিতার্থ করিবার সঙ্কল্প এমনই নিষ্ঠার সহিত সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র এখন আর গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নহে, কলিকাতা

সহরের বিভিন্ন অংশের উপর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়াছে; প্রথমেই তাহার আভাব কতকটা পাওয়া গিয়াছে।

ছয়

বাহির হইতে রায় সাহেব কালিদাস কয়ালের বাড়ীখানিকে যেমন সুন্দর ছবিটির মত দেখায়, বাড়ীর ভিতরে দ্বিতলের ড্রয়িং রুমে ঢুকিলে তাহার সজ্জা ও মূল্যবান আসবাবপত্র রুচি ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়া সমাবিষ্টদের চিত্ত ও চক্ষুগুলি তেমনই আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

নিজের সাজানো পড়িবার ঘরখানি ছাড়িয়া মাধুরী ইদানীং অধিকাংশ সময়, বিশেষত বিকেলের দিকটা, এই ঘরেই অতিবাহিত করে। এখন তাহার হাতে একটি নূতন কাজ আসিয়াছে, সে কাজটি আর কিছুই নয়—অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্ত আত্মীয়পুত্র বিপিনকে শিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করিয়া তোলা। সকালের দিকে মাধুরীর অবসর বড় অল্প, নিজের পাঠাগারে বসিয়া গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কলেজের পড়াশুনা করিতে হয়, চায়ের টেবিল ও ভোজের ঘরে পিতার কাছে না বসিলে তাঁহার খাওয়াই হয় না; এক সঙ্গে কন্যার সহিত ভোজন সারিয়া তিনি তাহাকে তাহার কলেজে নামাইয়া দিয়া নিজের আফিসে চলিয়া যান। বৈকালে অনেক আগে কলেজের ছুটি হইলেও মাধুরী কিন্তু বাড়ী ফিরিত পিতার সঙ্গেই। রায় সাহেবের নির্দ্দেশ মত গাড়ী কন্যার কলেজের দ্বারে প্রতীক্ষা করিত, ছুটির পর 'সফর' সারিয়া কন্যা

পিতাকে তাঁহার আফিস হইতে তুলিয়া আনিত। আফিসেই তিনি কন্যার প্রতীক্ষা করিতেন। কিন্তু বিপিন আসিবার পর হইতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মাধুরী পিতাকে বলিয়াছে, বাপী, আমার ত ছুটি অনেক আগেই হয়, মিছিমিছি এখানে ওখানে ঘোরা-ঘুরি করি, এখন থেকে আমি আগেই বাড়ী ফিরবো, কেননা, বিপিনকে ঐ সময়টা আমি শিখিয়ে পড়িয়ে সভ্য করে তুলবো। আমি বাড়ী ফিরেই তোমার আফিসে গাড়ী পাঠিয়ে দেব।" রায় সাহেব কন্যার প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়াছেন। কাজেই কন্যা এখন ছুটির পরই কলেজ হইতে সরাসরি বাড়ী ফেরে এবং বিপিনকে লইয়া একত্র জলযোগ সারিয়াই তাহাকে পড়াইতে বসে। যদিও বিপিনের পড়াশুনার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই আছে,—মাধুরীর পড়ার ঘরের পাশেই বিপিনের জন্য একখানি ঘর সাজাইয়া গুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সকালের দিকে আলাদা একজন শিক্ষক আসিয়া তাহাকে পড়ায়, তথাপি এই সময়টা মাধুরী বিপিনকে লইয়া সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমের মধ্যস্থলে, গোল টেবিলখানি আশ্রয় করিয়া বসে। শিক্ষা-সম্পর্কে যদিও বিপিনের বিদ্যার দৌড় এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালার ভিতরেই আবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু টেবিলখানার উপর সাজানো বাঙ্গলা ও ইংরাজী বড় বড় কেতাব ও পত্রিকাদির প্রাচুর্য্য যেন জানাইয়া দিতেছি উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কত গভীর গবেষণাই এখানে চলিয়া থাকে।

গোল টেবিলখানার ওপারে মাধুরীর সামনাসামনি বসিয়া বিপিন এই শিক্ষিতা মেয়েটির মুখনিঃসৃত কথাগুলি যেন নিবিষ্ট মনেই গিলিতে-

ছিল। মাধুরীর হাতে নয়নরঞ্জন অঙ্গাবরণে মণ্ডিত নূতন সংস্করণের এক ভলিউম শেক্সপীয়ার,—ইহার ভিতর হইতে ম্যাক্‌বেথের গল্পটি বাছিয়া সে তাহার এই কৌতূহলী ছাত্রকে শুনাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া মাধুরী তাহার ছাত্রস্থানীয় শ্রোতাটিকে জিজ্ঞাসা করিল: ম্যাক্‌বেথের গল্পটা কেমন বিপিন? ভালো লাগছে তোমার?

মুখে ও চোখে বিস্ময়ানন্দের রেখা ফুটাইয়া বিপিন উত্তর দিল: বেশ দিদিমণি, খাসা গপ্পো, আমার ভারি ভ'লো লাগছে।

মাধুরী পুনরায় প্রশ্ন করিল: ম্যাক্‌বেথ লোকটাকে কেমন মনে হচ্ছে বিপিন?

বিপিন চোখদুটি টানিয়া বড় করিয়া বলিল: বাস্‌রে! কত বড় তার হিম্মত, যে-সে মানুষ কি আর তিনি দিদিমণি, যাকে বলে—বীর, তাই।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া মাধুরী বলিল: ঠিক তোমার পরশুরাম দাদার মতন, নয় বিপিন?

বিপিন এ কথার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, মুখখানি নীচু করিয়া টেবিলের উপরে সাজানো বিলাতী একখানি ম্যাগাজিনের মলাটটি নাড়িতে লাগিল।

মাধুরী একটু গম্ভীর হইয়া বলিল: চুপ করে রইলে যে বড়, যা জিজ্ঞাসা করলুম, উত্তর দাও।

মুখখানি এবার আস্তে আস্তে তুলিয়া এবং গলায় কিঞ্চিৎ জোর দিয়া বিপিন বলিল: আমার পরশুরাম দাদা হচ্ছেন দিদিমণি, দেবতা! আর আপনি ঐ-যে 'মার্‌বেত' লোকটার কথা কইলেন—ও শুধু মার-

ধর করতেই জানে। তাই নামটাও ঠিক হয়েছে—'মার্-বেত'। কিন্তু আমার পরশুরামদা পথের ভিখিরীকেও কোলে তুলে নেন। ঠিক নয়? আপনিই বলুন না?

মাধুরী হাসিয়া ও তাহার সুশ্রী ভুরু দুটি নাচাইয়া বলিল: দেবতাকে তুমি কি কোনদিন দেখেছ বিপিন, যে অমনি একটা মানুষকেই দেবতা বানিয়ে দিলে?

বিপিন বলিল: চোখে না দেখি, কানে ত শুনেচি ওঁদের কথা দিদিমণি! ঐ যে বেতমারা মানুষটার কথা কইলেন আপনি, চোখে ত দেখেননি তাকে, কেতাবেই পড়েছেন, এ ও ত ঐ শোনা কথার সামীল হয়ে গেল। আমি কিন্তু দিদিমণি না-বলে পারবো নি—দেবতা আমি দেখিচি, আর আমার সেই দেবতা হচ্চেন ঐ পরশুরামদাদা!

মাধুরী বলিল: দূর্ দূর্! দেবতা বুঝি কখন এমন নির্ম্মম হয়? পরপর তিনটে হপ্তা চলে গেল, সেই যে নেমন্তন্ন বাড়ীতে আমরা তোমাকে চেয়ে নিলুম, তারপর একবারে চুপ! চিঠি ত অতগুলো তুমি লিখলে—দেখতে আসা ত পরের কথা, জবাব তার কিছু দিলে তোমাকে? এই মানুষ তোমার চোখে দেবতা, বিপিন?

বিপিন দমিল না, সপ্রতিভ কণ্ঠেই উত্তর দিল: দেবতা বলেই তিনি চুপ করে আছেন দিদিমণি, গায়ে-পড়া হয়ে ছুটে আসেন নি। এখানে এসে অবধি এই কটা হপ্তায় আমি ত দেখতে পাচ্ছি দিদিমণি, কত রকমের কত মানুষই তোমার কাছে আসে, বসলে আর উঠতে চায় না, তুমি বেজার হ'চ্চ জেনেও তারা নড়ে না। তুমি তাদের ডাকোনা, এলে খুশীও হও না, তবু তারা বেহায়ার মত

আসবেই। ঠিক যেন মাচি, তাড়া দিলেও গ্রাহ্যি নেই, ভন্ ভন্ করবেই। আমার পরশুরাম দাদা ত মাচি নন, তিনি যে দেবতা। বিপিনের চিটি কি তাঁকে আনতে পারে দিদিমণি, তাঁকে আনতে হয় আরাধনা ক'রে।

মাধুরীর মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বিপিনের প্রতি কথাটি যেন সূঁচের মত তাহাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বিঁধিতে লাগিল। বিপিনের চিঠির আঁকা-বাঁকা অক্ষরগুলিকে সাজাইবার ভাষা মাধুরীকেই যোগান দিতে হয় এবং দৈনন্দিন ডাকের মধ্যে অতি বাঞ্ছিত চিঠিখানিই সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ করে। এমন কি, প্রত্যহ অপরাহ্নে ড্রইংরুমের গোল টেবিলখানি গ্রন্থসম্ভারে সাজাইয়া সে যখন বিপিনকে লইয়া পাঠচর্চ্চায় রত থাকে, তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষাটির সহিত বিপিনের পত্রবর্ণিত প্রার্থনাটির সংযোগও ত অসম্ভব না হইতে পারে! বিপিনের পত্রে প্রার্থনা আছে—অপরাহ্নে তার ছুটি, সেই সময় যদি তার দেবতা তাহাকে দেখা দিয়া ধন্য করিতে আসেন, সে কৃতার্থ হইবে। ফলে এমনও হইতে পারে ত, পত্রের অভাবে পাত্রেরই আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তিন সপ্তাহব্যাপী আশা-প্রতীক্ষার পর হতাশ হইয়া এইদিন কথা-প্রসঙ্গে মাধুরী বিপিনের দেবতাকেই নির্ম্মম বলিয়া অনুযোগ করিলে, বিপিন তাহার উত্তরে মাধুরীর গুণমুগ্ধ স্তাবকদের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার দেবতার যে পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, মাধুরী প্রথমটা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইলেও, মনে মনে বিপিনের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন না হইয়া পারিল না।

বিপিন এই সময় কৌতুহলের সুরে বলিয়া উঠিল: তারপর কি হ'ল

ঐ গল্পোটার আপনি সেইটুকু শুনিয়ে দিন দিদিমণি! ঐ মার্বেতের লোভটা তো তারপর—

মাধুরী হাসিয়া বলিল : মার্বেত নয় বিপিন, ম্যাক্‌বেথ তার নাম।

বিপিন বলিল : ও একই কথা দিদিমণি, কথায় বলেনা—যার নাম ভাজা চাল, তারই নাম মুড়ি! এও ঠিক তাই গো! তা আপনি ঐ নামটাই আপনার গপ্পে বলে যান, আমি ঠিক তাকে চিনে নেবো।

হাসিয়া মাধুরী বলিল : নামটি তুমি দিয়েছ বেশ, কাল কলেজে গল্প করবার একটা 'ফ্যাক্ট' হ'লো। বলবো সেক্সপীয়ারের ম্যাক্‌বেথকে আমার একটি ভাই মার্বেত বলে ভয় দেখিয়েছে—নামটা আর একবার বলত বিপিন, তোমার মুখেই শুনি বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

বিপিন মুখখানি গম্ভীর করিয়া এবং গলায় প্রচুর জোর দিয়া বলিয়া উঠিল : মার্‌-বেত—মার্‌-বেত—

পরক্ষণেই দ্বারের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে দেখিল, একটা লোক নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া দরজার উপর ঝুলানো পরদাটির পীঠে পীঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অমনি সেই দিকে আঙুলটি বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল : ঐ দেখুন দিদিমণি, আপনার গল্পের মার্‌-বেত—হুবহু তাই—দেখুন।

আগন্তুককে দেখিয়াই মাধুরীর মুখখানা যেন ছা'য়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কিন্তু সে ভাবটুকু সামলাইয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং মুখে ও চোখে কৌতূহলের ভঙ্গী ফুটাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল : এই যে মিষ্টার চৌধুরী, কবে ফিরলেন কলকাতায়?

গোটা মানুষ

খবর সব ভালো ত ? অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন,—আসুন আসুন—বসুন।

মুখখানা বিকৃত করিয়া রুক্ষস্বরে আগন্তুক কহিল : Shame !

আগন্তুকের চেহারায় আভিজাত্যের বেশ একটু আমেজ পাওয়া যায়। দিব্য সুশ্রী ও সুন্দর মুখশ্রী ; কিন্তু আকৃতিতে তাহার নারী সুলভ কোমলতা ও কমনীয়তার যত বাহুল্যই থাকুক, প্রকৃতি যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, মুখের শব্দটাই সে পরিচয় যেন স্পষ্ট করিয়া দিল। পক্ষান্তরে ছেলেটির সাজ-পোষাক এবং কথার ভঙ্গী যেন প্রত্যেকের চোখে আঙুল দিয়া জানাইতেছিল, গায়ের সারা রঙটা উপর চিহ্নিত একটা খোলস চড়াইলেই সাধারণে সম্ভ্রমের সহিত যাহাদিগকে 'সাহেব' আখ্যা দিয়া থাকে, আগন্তুকও সেই আখ্যাত ব্যক্তি। বয়স বড় জোর ছাব্বিশ, কিন্তু গাম্ভীর্যটুকু দেখিলে মনে হয়, সেটি যেন ঠিক বয়সোচিত নহে। চোখ দুটি মুখের তুলনায় তীক্ষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ। নাম মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ; কিন্তু নামের অধিকারী নিজেই নামটাকে কাটছাঁট করিয়া লইয়াছে এবং তাহার ইচ্ছানুসারে মিষ্টার চৌড্রী রূপেই তাহা চালু হইয়া গিয়াছে। তবে যাহাদের উপর জোর চলে না—যেমন মা, মামা, দিদি, মাধুরীর বাবা রায়সাহেব কয়াল, ইঁহারা মিষ্টার চৌড্রী ত আর বলিতে পারেন না, কাজেই এখানে মিষ্টার চৌড্রী 'মিতু' নামেই পরিচিত। আমরাও অগত্যা তাহাকে মিতু বলিয়াই উল্লেখ করিব।

মাথার হ্যাটটি একহাতে লইয়া, অপরহাতের আঙুলটি বিপিনের দিকে হেলাইয়া মিতু বলিল : ধন্যবাদ ! কিন্তু বলবার আগে জানতে

চাই—এটি কে? আমাকে দেখেই বেত মারবার জন্যে হাই স্পীডে চাৎকার তুললোই বা কেন? ইচ্ছাটি কার?

মাধুরী এক গাল হাসিয়া বলিল: সেক্সপীয়ারের।

টেবিলের উপর খোলা খেতাবখানার দিকে চাহিয়া মিতু বলিল: 'ইম্‌পসিবল! ঐ ভদ্রলোক কখনো এমন 'ব্রুট' হতে পারেন না যে, কোন অতিথি বাড়ীতে এলেই অসভ্যের মত চেঁচিয়ে বলবেন—মার্‌ বেত!

মাধুরী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল: মার্‌ বেত নয় মিষ্টার চৌধুরী,—ম্যাক্‌বেথ। আমি একে জিজ্ঞাসা করছিলুম—কোন লোকটি ভালো, ম্যাক্‌বেথ, না, পরশুরাম? এ অমনি বলে উঠলো—পরশুরাম হচ্ছেন দেবতা—

মিতু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল: মিছে কথা, বেটা হচ্ছে পাজীর ধাড়ি, তার দাপটেই ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা জাত ভাঁড়িয়ে 'পদ্মরাজ' হয়ে যান। সে ডাকাতটার সঙ্গে বেতমারবার কথা এলো কেন?

মাধুরী বলিল: তার কারণ, বিপিন ম্যাক্‌বেথের উচ্চারণটা গুলিয়ে ফেলে 'মার্‌-বেত' করেছে। আমি যত বলি পরশুরাম পাজী, আর ম্যাক্‌বেথ দেবতা, ও ততই আপত্তি করে বলবে—দেবতা হচ্ছেন পরশুরাম, আর পাজী ঐ মার-বেত। আপনি ঢুকেই ওর মুখে ঐ শব্দটা শুনেছেন, আর পাঠশালার বেত মারার ভয়টুকুও আপনার মনটাকে দুলিয়ে দিয়েছে।—বলিয়াই মাধুরী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'ও, আই সী'—বলিয়া মিতু একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

গোটা মানুষ

বিপিন এই সময় মুখখানা ভার করিয়া বলিল : বেত কি আমার হাতে আছে মশাই, যে বেত মারবার কথা বলবো ? তা ছাড়া, আপনি হচ্ছেন সাহেব মানুষ,—বাস্‌রে ! ও ইচ্ছেটা আমি কখনো মনে আনতে পারি ? তবে, আপনি ঐ যে পরশুরামের কথা তুলে যা তা বললেন, সে পরশুরামের কথা ত আমাদের হয়নি, কথা হচ্ছিল—পরশুরাম দাদাকে নিয়ে। আপনার বয়সীই তিনি হবেন, কিন্তু আপনার মতন তিনি মার-বেত নন, সত্যিই তিনি দেবতা।

বিরক্ত ও অপ্রসন্নমুখে মিতু মাধুরীর দিকে চাহিয়া কহিল : এ উল্লুকটা বলে কি ?

মাধুরীর মুখের হাসি নিমেষে মিলাইয়া গেল। মুখখানা ভার করিয়া সে উত্তর দিল : এর নাম বিপিন মিষ্টার চৌড্রী, আমার ভাই হয়। কিন্তু আপনি এর অঙ্গের কোন্ নিদর্শনটি দেখে একে উল্লুক সাব্যস্ত করলেন বলুন ত ?

মিতু কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া উত্তর দিল : মুখের কথা থেকে অনেক কিছুই অনুমান করা যায়। এ-ছোকরা আপনার ভাই হয়ে বসে আছেন জেনে না হয় কথাটা প্রত্যাহার করছি। কিন্তু আমি এর কোন কথাই বুঝতে পারিনি, আপনি পেরেছেন ?

মাধুরী বলিল : এর কথা একটা কাহিনী ! শুনলে আপনার ধারণা পালটে যাবে, মিষ্টার চৌড্রী। আচ্ছা, আপনি অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, আমি খুব সংক্ষেপেই কথাটা আপনাকে শুনিয়ে দি।

মাধুরী তখন দিব্য সরস করিয়া সেদিনের সোণা-প্রতিষ্ঠানের সামনে

রাস্তার ঘটনা হইতে নক্ষত্র নিকেতনের ভোজের বৈঠকের গল্প, এমন কি, এদিনের সংলাপ পর্য্যন্ত সমস্তই মিতুকে শুনাইয়া দিল।

মিতু রিষ্টওয়াচের দিকে চাহিয়া কহিল : এই বাজে কথাটা আমাকে শোনাতে আপনি পুরো চল্লিশ মিনিট অপব্যয় করলেন মিস্ কোয়েল!— নিজের কৌলিক উপাধি 'চৌধুরী'কে 'চৌড্রী' করিয়া তাহার বান্ধবীর 'কয়াল' উপাধিটাকেও সে 'কোয়েল' করিয়া লইয়াছে!

মাধুরীর ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল : নিজের রুচির মাপকাঠিতে পরের খরচের সৎ অসৎ যাচাই করা শুধু হাসির কথা নয় মিষ্টার চৌড্রী, রীতিমত অন্যায়। আপনার বিচারে যেটা অপব্যয়, আমি সেটাকে সদ্ব্যয় বলেও ত মেনে নিতে পারি?

মিতু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল : তাহলে পরশুরাম নামক লোকটির সঙ্গে আপনাদের খুব ইন্‌টিমেসি' হয়েছে বলুন?

মাধুরী কহিল : তবে আপনি শুনলেন কি? বিপিন সেই থেকে অন্ততঃ পাঁচখানা চিঠি তাঁকে লিখেছে, কিন্তু বেচারা এ পর্য্যন্ত কোন জবাবই পায় নি। যাক্, এখন আপনার কথা বলুন। কলকাতায় কবে এলেন?

—আজই, সকালের ট্রেনে।

—ওয়াল্‌টিয়ার থেকেই তাহলে আসছেন? বাড়ীর সকলেই এসেছেন?

—হ্যাঁ। এবার আমার কথার জবাব দিন ত, ওয়ালটিয়ার থেকে ওদিকে যে-সব চিঠি লিখেছি, সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছেন। কিন্তু

লাষ্ট থ্রী উইক্‌সের ভেতর আপনি একবারে নিস্তব্ধ, তিনখানা চিঠি আমি দিয়েছি, আপনি কোনখানারই জবাব দেননি। কি ব্যাপার বলুন ত?

মাধুরী নীরবে টেবিলের উপর একখানা ব'য়ের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি সংযোগ করিল, মুখে কিছুই বলিল না। মিতু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল: কথাটার ত জবাব দিলেন না? চিঠি তিনখানা কি আমার পাননি?

মাধুরী উত্তর দিল: পেয়েছি। কিন্তু শরীর আর মনের অবস্থা ভাল না থাকায়, তার ওপর, এই বিপিনের পড়াশোনার ব্যাপারে সারা বিকেলটা ব্যস্ত থাকতে হয় বলে, উত্তরটা দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, তবে আজ যদি আপনি না আসতেন—তু'একদিনের মধ্যেই চিঠি একখানা আপনার কাছে যেত' নিশ্চয়ই। বাপী বলছিলেন, তাঁর আফিসে একটা পোষ্ট খালি হচ্ছে শীগগীর, সাড়ে তিনশো টাকার গ্রেড, তাঁর হাতে আছে, আপনাকে লেখবার জন্য আমাকে বলছিলেন; যাক,আপনি এসে পড়েছেন ভালোই হয়েছে।

চাকরীর খবরটা শুনিয়া মিতুর অন্তরটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সে ভাবটুকু সবলে চাপিয়া কহিল: এই খবরটুকু দেবার জন্যই শুধু চিঠি লিখতেন?

স্থির দৃষ্টিতে মিতুর মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী বলিল: খবরটার কোন গুরুত্বই কি আপনি উপলব্ধি করছেন না মিষ্টার চৌড্রী? অথচ আমি ত জানি, এই ধরণের একটা ভালো চাকরীর জন্য আপনি বাপীর কাছে অনেক উমেদারীই করেছেন!

মুখখানা একটু কঠিন করিয়া মিতু কহিল: সে সব অনেক কথা,আপনার

বাবা আমার অত্যন্ত হিতৈষী, যাকে বলে—'ওয়েলউইসার।' উচ্চ শিক্ষা বা আমার বিলেত যাওয়ার সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের কোন সম্বন্ধই ছিল না। আমার বাবা যা রেখে গেছেন, রাজার হালেই তাতে সমস্ত জীবনটা আমার কাটিয়ে দেওয়া চলে। তবুও, আপনার বাবার ইচ্ছা, ভালো রকমের একটা কাজে লেগে পড়ি, তাতে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকবে, সম্পত্তির টাকায়ও হাত পড়বে না—সেটা আরও বাড়বে। তাঁর এ পরামর্শ আমি ঠেলতে পারিনি। পাই এ চাকরী ভালোই, না পাই ক্ষতিও নেই। কাজেই আপনার চিঠি যদি শুধু ঐ চাকরীর খবর নিয়েই যেত', আমার পক্ষে সেটা যে খুবই আনন্দদায়ক হ'ত—একথা আমি জোর করে বলতে পারি না।

কথাটার যোগ্য উত্তর মাধুরীর মুখে আসিলেও এই ছেলেটির সহিত অতীতের নিবিড়তম ঘনিষ্ঠতার প্রসঙ্গ তাহার স্মৃতি পথে যেন সুস্পষ্ট হইয়া তাহার মুখখানা বন্ধ করিয়া দিল, বলি বলি করিয়াও কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া বিপিনের সম্মুখে সে-সব কথার আলোচনা সে যুক্তি সঙ্গত মনে করিল না।

মিতুও উপলব্ধি করিতেছিল, তাহার এই অন্তরঙ্গ বান্ধবাটির মনে একটা কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সহসা যেন অতীতের দৃশ্যপট তাহার মানস চক্ষুর উপর ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

ঘটনাচক্রেই এই পরিবারটির সহিত সে পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। সেই আকস্মিক পরিচয়টুকু এমনই আশ্চর্য্য ভাবে মধুর ও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে যে, গৃহস্বামী তাহাকে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—'তুমি যে আমাদেরই ছেলে হে! অতি

আপনার তুমি। এ বাড়ী তোমার নিজের মনে করে অসঙ্কোচে আসবে, বেবীর সঙ্গে মিশতে তুমি যেন কুণ্ঠিত হয়ো না; ওর মা আছে কোন সঙ্গিনী,না আছে কোন বন্ধু; আজ থেকে তুমিই ওর বন্ধুবান্ধব সব হলে!" আর মাধুরী,ঠিক সেইসময় মৃদুহাস্যরঞ্জিত সলজ্জ মুখখানি তুলিয়া চাহিতেই মিতুর সহিত তাহার চোখোচোখি হয় এবং মাধরীর সেই মধুর দৃষ্টিটুকুতেই মিতু তার মনের কথাটি যেন সুস্পষ্টভাবেই পাঠ করে—'হে বন্ধু, এসো তুমি. আমার হৃদয়মন্দিরের দোরটি খুলে আমি তোমাকে সাদরে আহ্বান করছি।' প্রথম দর্শনেই এই মেয়েটিকে সে যে ভুল বুঝে নাই, আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের মধ্যে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়—এবং তাহা ক্রমশঃ গভীর হইয়া উঠিলে, দুইটি হৃদয় তন্ত্রীর গ্রন্থিবন্ধন সম্পর্কে সে যে মিথ্যা উপলব্ধি করে নাই, দীর্ঘ তিনটি বছরের অবাধ মেলামেশায় এবং গত ছয়টি মাস সপরিবার ওয়ালটিয়ারে অবস্থিতিকালে অসংখ্য পত্রের আদান-প্রদানে তাহার কত নিদর্শনই সুস্পষ্ট রহিয়াছে! মাত্র তিনটি সপ্তাহের ব্যবধানে ইহাদের নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব, একপক্ষের সুদীর্ঘ নিস্তব্ধতার উপেক্ষায় এই যেন প্রথম ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে।

নিরুত্তর মাধুরীর আরক্তিম মুখখানির উপর শুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মিতু মনে মনে অতীতের এই মর্ম্মস্পর্শী অধ্যায়টির পৃষ্ঠাগুলি পড়িতেছে, এমন সময় পরদা ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন গৃহস্বামী রায়সাহেব কয়াল এবং তাঁহার পশ্চাতে মিতুর একান্ত অপরিচিত, কিন্তু কক্ষের আর দুইটি প্রাণীর সুপরিচিত ও অতিশয় আকাঙ্ক্ষিত পরশুরাম।

প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই রায় সাহেবের কণ্ঠধ্বনি কক্ষের তিনটি প্রাণীকেই

সচকিত করিয়া দিল ঃ—এই দেখ বেবী, অফিসের পালটা পরশুরামকে তার আফিস থেকেই পাকড়ে এনেছি।

কথাটা শেষ করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই মিতুর সহিত তাঁহার চোখোচোখি হইয়া গেল। অমনি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : হ্যাল্লো। কবে ফিরলে ওয়াল্টেয়ার থেকে মিতু? কেমন আছ? বাড়ীর খবর সব ভালো? মা সেরেছেন?—এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলি সারিয়া এবং উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি পিছনের সঙ্গীটীকে অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো পরশুরাম, ব'স এই সোফাটায়।

মিতুও গৃহস্বামীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল এবং বিলাতি কায়দায় যথোচিত অভিবাদন করিতেও ভুলে নাই। পরশুরামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াই রায় সাহেব মিতুর দিকে চাহিয়া বলিলেন : ব'স, মিতু ব'স—দাঁড়িয়ে রইলে যে,—ব'স।

প্রায় এক সঙ্গেই তিনজনে বসিলেন। মাধুরী ইতিমধ্যেই তাহার দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি পরশুরামের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া হাতের খোলা বইখানার পাতায় ফেলিয়াছিল। কিন্তু পরশুরামকে অন্য কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিতে দেখা গেল না। আসনখানি গ্রহণ করিয়াই সে গৃহস্বামীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিপিন আর তাহার শ্রদ্ধাভাজন দাদাটির উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রকাশের অবসরই পায় নাই, এইবার উঠিয়া তাহার পায়ের তলায় মাথাটি হেঁট করিয়া প্রণাম করিল, তার পর মৃদুস্বরে কহিল ঃ—ভালো আছেন দাদা?

পরশুরাম তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া হাসিমুখে কহিল :—বাঃ! ক'দিনেই বেশ ফিটফাট হয়েছ দেখছি যে!

রায় সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ঠিক ধরেছ পরশুরাম, কে বলবে—এই ছেলেটাকে নিয়েই তিন 'উইক্' আগে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটবার যোগাড় হয়েছিল! তুমি হচ্চ জহুরী লোক, চীজটিকে তখন ঠিক চিনে ফেলেছিলে। যাই হোক, বিপিন খুব চালাক চতুর, তার ওপর যার হাতে পড়েছে—শীগ্‌গীরই 'আপ টু ডেট' হয়ে দাঁড়াবে, বলিয়াই—তিনি বক্রদৃষ্টি কন্যার আরক্ত মুখখানার দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

মিতু এই সময় গলাটা ঝাড়িয়া রায় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল : আপনার শরীর বেশ ভাল ত?

মিতুর কথায় রায় সাহেবের বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল, তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন উত্তরই পান নাই। ব্যগ্রভাবে কহিলেন :—হ্যাঁ, আমি ভালোই আছি। তোমাকে দেখে ভারি খুসী হয়েছি মিতু,—ছ' মাস পরে দেখা, কত কথাই তোমার সঙ্গে আছে! তাহলে সেখানকার বাসা তুলেই এসেছ বল?

মিতু মৃদুস্বরে উত্তর দিল :—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—খবর তাহলে সব ভাল। মা'র শরীর সেরেছে?

—হ্যাঁ।

—ভাল কথা, বেবীকে লিখতে বলেছিলুম, তোমাকে জানাতে—হেড-য়্যাসিষ্ট্যান্টের পোষ্ট একটা শীগ্‌গীর খালি হচ্ছে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনিছি এবং আমি প্রস্তুত আছি।

—কিন্তু কথা হচ্ছে, পোষ্টটা খালি হবার আগে আমি তোমাকে হাতে কলমে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে চাই। আসছে সোমবার থেকে তুমি আমার সঙ্গে বেরুবে। দুটো হপ্তার ভিতরেই আমি তোমাকে ওয়াকিফহাল করে তুলবো।

চাকরীর ব্যাপারটা তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে আলোচিত হয়, মিতুর তাহা ইচ্ছা নয়, তাই বিষয়টা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল:—বেশ, সোমবারই আপনার আফিসে আমি দেখা করবো, সেই দিনই সেখানে সব কথাবার্ত্তা হবে। তাহলে আজ উঠি—

রায় সাহেব বলিলেন: এখুনি উঠবে কি হে, ক'দ্দিন পরে এসেছ, কত কথাবার্ত্তা আছে, ব'স;—হ্যা, পরশুরামের সঙ্গে তোমার বোধ হয় আলাপ পরিচয় নেই—

কথাটা দুই যুবককে সহসা সচকিত করিয়া দিল এবং এক সঙ্গে উভয়েই চাহিতে তাহাদের চোখোচোখি হইয়া গেল।

রায় সাহেব কহিলেন:—পরশুরামবাবু খুব বড় ব্যবসায়ী, যাকে বলে—রীতিমত মার্চ্চেন্ট; অল্পদিন হল এঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। আহ্লাদের কথা যে, ইনি আমাদের স্বজাতি। এই বয়সে ইনি যে বিরাট কারবার ফেঁদে বসেছেন, দেখলে অবাক হতে হয়। জানলে বেবী, আজ পরশুরামের আফিসে গিয়েছিলুম, পরশুরাম নিজে আমাকে সঙ্গে করে আফিসের ডিপার্টমেন্টগুলো দেখালে। হ্যা, দেখবার মত প্রতিষ্ঠান বটে, বাঙ্গালীর গর্ব্বের বস্তু। তোমাকেও একদিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো।

মাধুরীর বক্রদৃষ্টি পরশুরামের মুখখানার উপর পড়িল। এ অবস্থায় পরশুরামের মত তরুণ যুবার বুভুক্ষু চক্ষু দুটি তাহার দিকেই নিবদ্ধ থাকিবার কথা এবং চোখোচোখি হওয়াটাও স্বাভাবিক, কিন্তু আশ্চর্য্য, কক্ষের দেওয়াল-সংলগ্ন একখানা ছবির দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া পরশুরাম তখন বসিয়াছিল। মাধুরীর মুখখানা পুনরায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

রায় সাহেব অতঃপর মিতুর প্রসঙ্গ তুলিলেন, বলিলেন: মিতুর সঙ্গে তোমারও পরিচয় নেই দেখছি পরশুরাম। খাসা ছেলে-বি, এ. পাস করে বিলেত যায়। ওর বাবার ইচ্ছা ছিল—মিতু আই. সি. এস হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের পোষ্টে বসবে। কিন্তু হেল্‌থের দরুণ সেটা আর হয়ে ওঠেনি। নাই হোক, কাজের কোন ভাবনা নেই, আমাদের আফিসেই ওকে একটা বড় পোষ্টে বসিয়ে দেব, পরে অফিসার হয়ে যাবে। মিতুদের নাম ডাকও খুব, বিষয় আসয়ও প্রচুর। ওর মার শরীর খারাপ ব'লে, ওরা সব এ্যাদ্দিন ওয়ালটিয়ারে ছিল, ছ' মাস পরে আজ ফিরেছে। যাই হোক, তোমাদের দুজনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হলে আমি খুসী হব।

পরশুরাম যুক্ত হাত দুখানি কপালে ঠেকাইয়া মিতুকে নমস্কার করিল, তারপর হাসি মুখে বলিল:—আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় না থাকলেও আপনাকে আমি জানি।

সবিস্ময়ে মিতু কহিল,—আমাকে জানেন, আশ্চর্য্য ত! কিন্তু আমি আপনাকে কখন দেখিছি বলে মনে হয় না।

পরশুরাম কহিল:—আপনি বরাবরই কলকাতায় মানুষ, তার

পর পড়াশুনা শেষ করেই বিলেতে যান, অনেকদিন সেখানে কাটান; কাজেই দেখা শোনা হয়নি।

মিতু কহিল:—আপনি ত আমার পুরো নামও শোনেন নি, তবে—

পরশুরাম হাসিয়া কহিল:—আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে? কিন্তু দৌলতগাছির কাছারী-বাড়ীতে আপনার বাবা সর্ব্ববিজয় চৌধুরী মশাই যেদিন হঠাৎ মারা যান, আপনি যদি তখন দেশে থাকতেন— সেই সময়ই দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত আমাদের। আপনার বোধ হয় মনে আছে, আপনি তখন কেম্ব্রিজে পড়েন, আপনার বাড়ীর আর আর সকলে সে সময় বিন্ধ্যাচলে,—কাজেই আপনার বাবার শেষের কাজটুকু তখন আমাকেই করতে হয়েছিল!

মিতু কহিল:—তাঁর কাজ কে করেছিল জানি না, তবে বাবা যে সে সময় জমিদারী দেখতে গিয়ে কাছারী বাড়ীতে ছিলেন, আর হঠাৎ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়—এ কথা আমি শুনেছি। আপনারও কি তাহলে ঐ অঞ্চলেই নিবাস?

পরশুরাম কহিল:—আজ্ঞে হ্যাঁ। যে দৌলতগাছির নাম বললুম, ঐ গ্রামখানিই আমার জন্মভূমি। শুনিচি আমার পূর্ব্বপুরুষ নবাবী আমোলে ঐ গ্রামে বাস পত্তন করেন।

মিতু কহিল:—ঐ গ্রামখানা আমাদের তালুকের ভিতরেই বলে শুনিছি।

—শুনেছেন, এ কথার মানে? আপনার বাবার অবর্ত্তমানে আপনিই যখন তাঁর ওয়ারিসান, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত আপনার অভিজ্ঞতা

থাকা উচিত। আমার বিশ্বাস, চর্ম্ম-চক্ষুতে দৌলতগাছির চেহারাখানাও আপনি দেখেননি।

—কি করে দেখবো বলুন? আমার পিতামহ কিছুদিন ওখানে বাস করেছিলেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকতে পারেন নি। ও-অঞ্চলের লোকগুলো এমনি বজ্জাত যে, তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই তিনি মরবার সময় বাবাকে বলে যান—বজ্জাতগুলোকে রীতিমত জব্দ করতে। কাজেই বাবা আর আমাদের সে-মুখো হতে দেন নি। তিনি মাঝে মাঝে যেতেন, আর চাবুক পিটে তাদের শায়েস্তা করে ফিরতেন। আমরা থাকতুম তখন কলকাতায়।

পরশুরাম হাসিয়া বলিল:—তাহলে আপনার কাছে একটা নতুন খবর আজ পেলুম যে, আপনার বাবা দৌলতগাছির বজ্জাতগুলোকে খালি চাবুক পিটতেই যেতেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে পারছি না মৃত্যুঞ্জয় বাবু—

মাধুরী এই সময় সহসা বলিয়া উঠিল:—সর্ব্বনাশ! আপনি ও-নাম ওঁর পেলেন কোথায়? উনি মোটেই নামটা পছন্দ করে না—

রায় সাহেব হাসিয়া বলিলেন:—হ্যাঁ, নাম সম্বন্ধে বাবাজীর একটু দুর্ব্বলতা আছে। তাই আমরা ওকে মিতু বলে ডাকি, আর বেবীর কাছে মিতু হচ্ছে মিষ্টার চৌড্রি।

পরশুরাম বলিল:—আর আমার কাছে উনি আমাদের মহামান্য ভূস্বামী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম,—আপনার বাবা যে চাবুকগাছটি মাঝে মাঝে দৌলতগাছির বাসিন্দাদের পিঠের

ওপর হাঁকরাতেন বলে শুনেচেন—উত্তরাধিকারসূত্রে আপনিও সেটি পেয়েছেন নাকি ?

মিতু মুখখানা শক্ত এবং কথাগুলি বিকৃত করিয়া পরশুরামের প্রশ্নটার উত্তর দিল :—বাবা যখন শেষ নিশ্বাস ফেলেন, আমার সঙ্গে ত দেখা হয়নি, আর তিনি যে-সব সম্পত্তি আমার জন্য রেখে গেছেন, এখনো সমস্ত বুঝে নেবার ফুরসদও পাইনি। কাজেই চাবুকটারও খোঁজ পড়েনি। তা ছাড়া, ঘোড়া এলে ত চাবুক! আমাদের জমিদারী-ঘোড়াটা এ পর্য্যন্ত চোখেই দেখিনি, নায়েব গোমস্তরাই সেটাকে চালাচ্চে, বাবার হাতের চাবুকটা তাদের হাতেই ওঠা সম্ভব।

পরশুরাম মৃদু হাসিয়া কহিল :—বা! পরিষ্কার জবাব দিয়েচেন আপনি, এর ওপর আর কথা নেই।—বলেই সে বিপিনের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল :—কি পড়া তোমার হচ্ছে বিপিন ?

প্রশ্নটার উত্তর দিলেন রায় সাহেব ; কহিলেন :—বিপিনকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছে, একজন মাষ্টারও বরাদ্দ করা হয়েছে বাড়ীতে পড়াবার জন্যে, এর ওপর বেবীর সুপারভিসন ত আছেই।

পরশুরাম কহিল :—কিন্তু এ-বয়সে ওকে আর স্কুলের ঘানিতে জুড়ে না দিলেই ভালো করতেন।

মিতুর গায়ের ঝালটুকুর তখনও নিবৃত্তি হয় নাই, এই মজলিসেই পরশুরামকে অপদস্থ করিবার জন্য তাহার মনটি উস্‌খুস্ করিতেছিল। স্কুল সম্বন্ধে কথাটা উঠিতেই সে এবার আঘাত দিবার একটা উপলক্ষ পাইল এবং বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করিল :—ভুলটা বুঝি পরশুরাম বাবুর দৃষ্টিতে কলুর ঘানি ?

গোটা মানুষ

পরশুরাম সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিল :—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ত তাই মনে হয়। এক ঘেয়ে অষ্টবন্ধন ব্যবস্থা দু-জায়গাতেই চালু আছে, আর যারা চলেচে, তাদের দেহ মন স্বাস্থ্য শক্তি এমন কি জীবনটা পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে উঠচে।

মৃদু হাসিয়া মিতু কহিল :—বুঝিচি, আপনি তাহলে স্কুলের পাট তুলে দিতে চান ?

পরশুরাম স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর দিল,—আপনি তাহলে ভুল বুঝেচেন, যে ধারায় আজকাল আমাদের দেশের স্কুলের শিক্ষা চলেচে আমি তারই পরিবর্ত্তন চাই ; এতে বোঝায় না-যে, স্কুলের দরজাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়।

—শিক্ষার ধারাটার কি গলদ আপনি পেয়েচেন ?

—অনেক। প্রথমত—সময়ের অপব্যয, দ্বিতীয়ত—ক্ষমতার অতীত অর্থ ব্যয়, তৃতীয়ত—স্বাস্থ্যহানি, চতুর্থ দফা হচ্ছে— পাস করবার পর একটি সজীব গ্রামোফোন হয়ে বেরিয়ে আসা। অষ্টবন্ধনের ভিতর থেকে আঙ্গুলের পাকে গুণে গুণে যে ক'টি বিষয় মুখস্থ করেচে—রেকর্ডের মত সেইগুলিই শুধু কপ্‌চাবে। একে শিক্ষা বলে না, আর এ শিক্ষার কোন দামই নেই।

রায় সাহেব মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া কহিলেন :—কথাটা কিন্তু ভারি শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্চে পরশুরাম, যাকে বলা চলে—সিরিয়াস।

মিতু একটু উত্তেজিত ভাবেই কহিল : আজকাল এ-ধরণের কথাগুলো মুরুব্বীর চালে বলা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েচে, এটাও

ঠিক মুখস্থ বুলি কপ্‌চানোর মত; আমাদের ইউনিভার্সিটি কিছু নয় তার শিক্ষা বাজে, দাম তার কিছু নেই! কিন্তু যারা এ-সব কথা নির্লজ্জের মত বলে, তারা ভুলে যায় যে, এই শিক্ষার ঘানি টেনেই বঙ্কিম চাঁড়ুয্যে, সুরেন বাঁড়ুয্যে, রাসবিহারী ঘোষ, তারক পালিত সি, আর, দাস, সার আশুতোষ, জগদীশ বোস বড় হয়েছেন, আর মাথা তুলে জানিয়ে দিয়েছেন—এঁদের শিক্ষার কি দাম।

পরশুরাম পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ স্বরেই কহিল:—যাদের নাম আপনি করলেন, তাঁরাই স্বীকার করেছেন এ শিক্ষার অনেক গলদ আছে, সংস্কারও এরা কিছু কিছু করে গেছেন। তা ছাড়া এঁদের কথা আলাদা—এঁরা হচ্ছেন গোটা মানুষ! অনেক চেষ্টা করেও এঁদের এক একজনের জোড়া আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন না। শুধু এঁরাই বা কেন—বছর বছর আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্ষ্ট ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়ে যাঁরা বেরোন, তাঁরাও কেউ বসে থাকেন না, তাঁরাও দেখিয়ে দেন বড় বড় চাকরীর দৌলতে শিক্ষার কি দাম! এঁদের ইন্টেলিজেন্ট বলা চলে, প্রতিভার জোরে প্রতিষ্ঠার আসনটি এরা দখল করে থাকেন। কিন্তু এদের নিয়ে আমার কথা নয়, আমার কথা সাধারণকে নিয়ে, যাদের লক্ষ্য করে কবি রবীন্দ্রনাথ আফশোষ করেছেন—

'সাত কোটী সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।'

মিতু কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল:—উচ্চ শিক্ষা যারা পেয়েচে, তাদের সবই পাওয়া হয়েচে, কিছুই তাদের কাছে বাধে না।

গোটা মানুষ

একটু হাসিয়া পরশুরাম কহিলঃ—বাধে। শুধু তাই নয়—পদে পদেই এঁরা হোঁচট খেয়ে পড়েন। এখানেও দোষ শিক্ষার, অষ্টবন্ধনে তাঁরা আড়ষ্ট। এই, আপনার কথাই তুলছি,—আপনি ত গ্রাজুয়েট হয়েচেন, বছর-কতক বিলেতে থেকেও পড়েচেন, সবাই জানে বিদ্যের জাহাজ আপনি, কিন্তু বলুন ত—আপনার জমিদারীর সেরেস্তায় বসে সেরেস্তার কাজকর্ম্ম চালাবার শিক্ষা আপনি পেয়েচেন? চিঠা, থোকা, রেওয়া, হস্তবুদ, আদায়-ওয়াশীল, খারিজ, পত্তনি—এ সব আপনি বোঝেন?

মুখখানা আরক্ত করিয়া মিতু উত্তর দিলঃ—কি দরকার? মাসে গোটা পনেরো টাকা বরাদ্দ করলে যখন এসব কাজে পাকা পোক্ত গোমস্তা পাওয়া যায়, জমিদার নিজে এ কাজে হাত দেবে কেন?

পরশুরাম অবিচলিত ভাবেই কহিলঃ—এই 'কেন' কথাটার উত্তর আমি আপনাকে পরে দেব। কিন্তু কথা যখন উঠচে, আমার প্রশ্নগুলো আপনাকে শুনতেই হবে। আপনি যখন জমিদার, আপনার জমির যারা ভাড়াটে প্রজা, তারা যদি জমির গলদ দেখায়, তার মেরামত করবার শিক্ষা ইউনিভারসিটি আপনাকে দিয়েচে?

মিতু বিরক্ত ভাবে কহিলঃ—আপনি পাগলের মত 'কোশ্চেন' করচেন। জমিদার বুঝি আবার জমি মেরামত করে দেয়?

পরশুরাম কহিলঃ—কেন দেব না? ভাড়া বাড়ীর গলদ হলে বাড়ীর মালিক চুপ করে থাকতে পারেন? তদারক করে তখনি মিস্ত্রী লাগান মেরামত করতে। জমির মালিক করবেন না? কেন

তবে এখানে মালিককেই মিস্ত্রী হতে হবে! জমির কি গলদ, তাতে কি অভাব, কিসে তার উর্ব্বরাশক্তি বাড়তে পারে, অল্প জমিতে বেশী ফসল কেমন করে উৎপন্ন হবে—এ সব বাতলাবে জমির মালিক। বলুন ত—জমির ব্যবসা ত তিন পুরুষ ধরে করে আসছেন, কিন্তু জমি চেনবার শিক্ষা কিছু আদায় করতে পেরেছেন?

মিতু মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইল, কোন উত্তর দিল না। পরশুরাম তথাপি তাহাকে নিষ্কৃতি দিল না, প্রশ্নের উত্তর না পাইয়াও পরবর্ত্তী প্রশ্ন তুলিল:—আপনি যখন জমিদার, বড় লোক, তার উপর বিলেত ফেরৎ, নিশ্চয়ই আপনার মটর একখানা আছে। আপনি চলেছেন মটরে; ধরুন—পথে মোটরখানা আপনার বিগড়ে গেল, কিম্বা সোফার বদমায়েসী করে আপনাকে জব্দ করবার জন্যে কলকব্জা বিগড়ে দিয়ে তেপান্তর একটা মাঠের ধারে মোটর শুদ্ধ আপনাকে ফেলে সরে পড়ল, আপনি তখন গায়ের কোটটা খুলে ফেলে মোটরের ইঞ্জিনে হাত লাগাতে পারেন? তাকে চালু করে আপনার বিদ্যের জোরে ফিরতে পারেন বাড়ীতে? এ শিক্ষা আপনি পেয়েছেন?

মিতু বলিল:—এ শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা আছে, ইচ্ছে করলেই শেখা যায়।

পরশুরাম কহিল:—আমরা সকলেই তা জানি, শুধু এই একটা শিক্ষা কেন—সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থাই যে আলাদা আলাদা আছে, একটা ছেলেও তা জানে। কিন্তু সমষ্টিগত শিক্ষার দিক দিয়ে আপনার মত উচ্চশিক্ষিতের শিক্ষাও যে অসম্পূর্ণ, আগের কটা প্রসঙ্গে তা প্রমাণ করেছি, এগুলো ছাড়াও অনেক আছে।

গোটা মানুষ

মিতু কহিল:—সেগুলোও বলে ফেলুন; যেমন—লড়াই করতে শিখিচি কিনা, এরোপ্লেন চালিয়ে বোমা ফেলতে পারি কিনা, লাঙ্গল ধরে জমির বুক চেরবার কিম্বা মানুষের পিঠের কার্ব্বঙ্কল অপারেশন করবার এডুকেশন কতখানি পেয়েচি, বলুন, বলুন।

সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠেই পরশুরাম মিতুর এই বিদ্রূপোক্তির উত্তরে কহিল:—নিশ্চয় বলব, আপনি সে শিক্ষাগুলোকে নিয়ে পরিহাস করচেন, আমি বলব—অন্ততঃ আপনার মত লোকের সেগুলো শিক্ষা করেই বিলাত থেকে ফেরা উচিত ছিল; লড়ায়ের কথাটাই আগে বলচি। মনে করুন, আপনি সফরে বেরিয়েচেন সখ করে। এখন দৌলতগাছির বিদ্রোহী প্রজারা আপনাকে কায়দায় পেয়ে হঠাৎ আক্রমণ করলে, এ অবস্থায় আত্মরক্ষার যে কৌশল আছে, আপনি নিশ্চয়ই সেটা শিক্ষা করেন নি, আপনার দেহের বাঁধুনি দেখেই আমার মনে হচ্চে—এক পাল লোক ত দূরের কথা, গুণ্ডাগোছের একটা লোকেরও মহড়া নেবার শক্তিও আপনার নেই। এর পর ধরুন, এরোপ্লেন চালাতে শেখা—বিস্ময়ের কথা কিছুতেই এটা নয়, ওদেশের মেয়েরাও এরোপ্লেনে উঠে দেশ বিদেশে পাড়ি দিচ্চে। লাঙ্গল চালাবার কথা যা বললেন, বাংলার যে সমাজে আমরা জন্মেচি—এইটিই ছিল আমাদের পেষা, এটাও দোষের নয়। বরং ওদেশে লাঙ্গলের যে উন্নত সংস্করণ হয়েচে, সেটা শিখে আপনার জমির ভাড়াটেদের যদি বাতলে দিতেন, তাহলে সত্যিকার একটা শিক্ষার খ্যাতি আপনার আভিজাত্যকে অলঙ্কৃত করত। অপারেশন করবার কথা যা বললেন, এটাও হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। আর সব শিক্ষার সঙ্গে এটাও শেখা যায়।

মিতু এবার মুখখানায় একটা বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিল:—মাপ করবেন, আমার আর বলবার কিছু নেই, বাজে কথা নিয়ে বৃথা তর্ক করতে আমি এভাবে অভ্যস্ত নই।

পরশুরাম কহিলঃ—কিন্তু সত্যিকার কাযের কথা নিয়ে তর্ক করায় লাভ আছে। আপনি বলবেন—যে গ্রাজুয়েট হয়েছে, ইউনিভারসিটীর ডিপ্লোমাই তার যথেষ্ট। আমি বলচি—আমাদের জীবনযাত্রায় ও ডিপ্লোমার কোন দাম নেই। কেন নেই—আপনার মত উচ্চশিক্ষিত বিলেত-ফেরতার শিক্ষার আলোচনা করেই তা দেখিয়ে দিয়েছি। অথচ এই উচ্চ শিক্ষাটুকুর জন্যে জলের মত আপনার পেছনে যে কত টাকা ঢালতে হয়েছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। ঐ ছেলেটার শিক্ষার কথা নিয়েই এই আলোচনায় এসেছি। স্কুলের যে ঘানিতে ছেলেটিকে এখন জুড়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু স্কুলের পড়া শেষ করে বেরুতেই ওর অন্ততঃ আটটা বছর লাগবে, তার পর আছে কলেজের শিক্ষা, গ্রাজুয়েট হতে আরও চারটে বছর। এই বারোটা বছর ধরে যে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ও কর্মক্ষেত্রে নামবে—সেটা সব দিক দিয়েই অসম্পূর্ণ। কিন্তু চেষ্টা করলে আটটা বছরের শিক্ষাতেই ওকে রীতিমত কাজের লোক করে তোলা যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাগুলো নিশ্চয়ই ওর গলায় ঝুলবে না।

রায় সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়াই ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন। পরশুরামের কথাগুলি তাঁহাকেও যে আকৃষ্ট ও অভিভূত করিয়াছে, তাঁহার মুখ দেখিয়াই তাহা উপলব্ধি হইতেছিল। কিন্তু ডিপ্লোমার কথাটা উঠিতেই তিনি যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিলেন :—এবার আমি না বলে পারছি না পরশুরামবাবু,—এগুলো ঠেলাও চলে না। এই ডিপ্লোমাই আজকাল আমাদের এডুকেশন, কালচার, সিভিলিজেসনের মাপকাঠি। আমার কথাই ধরো—ডিপ্লোমা না থাকলে আমি আজ একটা আফিসের অফিসারের পোষ্টে বসতে পাবতুম? যদি ঐ বিপিন ইউনিভারসিটীর কোন ডিপ্লোমা না পায়, যত ক্ষমতাই আমার থাকুক না কেন—আমার আফিসে আমি ওকে ঢোকাতে পারি? এই যে মিতুকে আমি প্রথমেই দেড়শো টাকার পোষ্টে বসিয়ে দেব বলেছি—শুধু কি ওর ডিপ্লোমার জোরে নয়?

পরশুরাম কণ্ঠস্বর এক্ষেত্রে অতিশয় নম্র করিয়া উত্তর দিল :—এর উত্তরটা কিন্তু রূঢ় হবে কয়াল মশাই, দয়া করে যদি মাপ করতে রাজী হন, তাহলে বলি।

রায়সাহেব প্রসন্ন ভাবেই বলিলেন :—বিলক্ষণ, আসলে এটা যে তর্ক—আমাদের সেটা মনে রাখা উচিত। প্রশ্ন যেখানে খাড়া, জবাব ত কড়া হবেই। তুমি বল।

পরশুরাম কহিল :—আমি বলতে চাই ডিপ্লোমার দরকার শুধু দরখাস্ত তৈরী করতে, পরের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশায় যারা হাত পাতবে—ডিপ্লোমা তাদের চাই-ই, নইলে চাকরী পাবে না, ভিক্ষে মিলবে না। কিন্তু যারা ওসবের তোয়াক্কা রাখে না, তাদের কাছে ডিপ্লোমার কোন দামও নেই, লোভও নেই।

কথাটা কিন্তু রায় সাহেবের প্রসন্ন মুখখানাকে বিবর্ণ করিয়া দিল। মিতু এই সময় সহসা পরশুরামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল :—

দেখুন, যদিও উচিত নয়, তবুও একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, দয়া করে আমাকে বলবেন—ইউনিভারসিটির সঙ্গে আপনার—

পরশুরামই তৎপর হইয়া সঙ্কুচিত মিতুর কথাটার অসঙ্কোচ উত্তর দিল :—বলবার মত কোন সম্বন্ধই আমার নেই আপনাদের ইউনিভারসিটির সঙ্গে। কৌতূহলের ঝোঁকে আমি হয়ত ওখানকার খবরগুলো রাখি, কিন্তু ওর দফ্‌তরে আমার নামগন্ধও নেই। শুনলে আপনি হয়ত অবাক হবেন, ম্যাট্রিকের পাস লিষ্টে পর্য্যন্ত আমার নামটি কোন দিন ছাপা হয় নি, অর্থাৎ ও রাস্তাই আমি মাড়াইনি কিনা!

একটা বড় রকমের দুশ্চিন্তার বোঝা পরশুরামের এই স্বীকারোক্তির সহিত বুঝি মিতুর মাথা হইতে সরিয়া গেল। বিস্ময়ানন্দের এক বিচিত্র আভায় তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, দুই চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৌতুক ও বিদ্রূপ ভরিয়া সে পরশুরামের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে, উচ্চশিক্ষার সংস্রবশূন্য এই দমবাজ ধূর্ত্তটির মুখের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, লজ্জার কোন নিদর্শনই তাহার চক্ষুর দৃষ্টি বা মুখের ভঙ্গীকে অপ্রতিভ করে নাই। তাহার বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টির আঘাতও তাহাকে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করিতে পারিল না। এরূপ লোকের উদ্দেশে সরাসরি কোন কথা বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া সে রায় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিল :— একেই বলে—A flash in the pan. কিন্তু ইনি আমাদের ঠকিয়েছেন খুব, এখন কেবলই মনে পড়চে—কথামালার বেঁড়ে শ্যালের

গল্পটা। নিজের ন্যাজটা নেই কিনা, তাই ন্যাজের বিরুদ্ধে অত লেকচার! আমি কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনাদের—

মাধুরী এই সময় মুখখানা আরক্ত করিয়া কহিল:—বাজে কথা নিয়ে আপনি কিন্তু অনর্থ বাধাচ্ছেন মিষ্টার চৌড্রি।

উচ্ছ্বাসে বাধা পাইয়া মিতু এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, মাধুরীর তীক্ষ্ণ মুখখানার দিকে চাহিয়া কহিল:—এর জন্যে দায়ী কে? আপনারা যদি একটা বাজে লোককে প্রশ্রয় দিয়ে—

মাধুরী এবার সোজা হইয়া উঠিয়া কহিল:—থামুন আপনি-ভদ্রতা রক্ষার সহজ বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন দেখছি। ইউনিভারসিটির ডিগ্রী এঁর নেই, এই অপরাধে ইনি বাজে লোক, এই কথা আপনি বলতে চান!

মিতু দৃঢ়স্বরে কহিল:—নিশ্চয়, অনধিকার চর্চ্চা যে করে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়। ম্যাট্রিকটাও যে পাস করে নি, আমাদের সঙ্গে এডুকেশন নিয়ে তর্ক করে সে কিসের স্পর্দ্ধায়?

মাধুরী কহিল:—এমনও হতে পারে ওঁর বিদ্যার স্পর্দ্ধায়। ইউনিভারসিটির ডিপ্লোমা না পেলেও যে বিদ্বান হওয়া যায়, আর আমরা সে রকম অতি-বড় বিদ্বানের পায়ের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াই—এমন লোকও অনেক আছেন। আপনি কি বলতে চান তাঁরাও বাজে লোক?

সদম্ভে উত্তর দিতে গিয়া সহসা কি ভাবিয়া মিতু মুখ বন্ধ করিল, অস্ফুট একটা হুঙ্কারের রেস ভিন্ন কোন শব্দই আর বাহির হইল না। রায় সাহেব সকৌতুকে এই বিতর্ক উপভোগ করিতেছিলেন. মিতুকে

নিরস্ত ও নিস্তব্ধ দেখিয়া তিনি কহিলেন: তাই ত মিতু, বেবী তোমাকে তর্কে হারিয়ে দিলে হে! বেবীর নজীর হয়ত—রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামমোহন রায়, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ মুখুজ্যে, রবিঠাকুর ইত্যাদি, কিন্তু তুমিও বলতে পারতে—পরশুরামের বিদ্যের দৌড়টাও দেখা দরকার—

পরশুরাম করযোড়ে কহিল: তার আগেই আমি জানিয়ে দিচ্ছি কয়াল মশাই, দৌড়বার মত বিদ্যে আমার মোটেই নেই। মাধুরী আমাকে বাড়াতে গিয়ে শেষে হয়ত নিজেই লজ্জা পাবে।

পরশুরামের মুখে এই প্রথম নিজের নামটি এভাবে শুনিয়া মাধুরীর মুখখানা বুঝি রাঙিয়া উঠিল, কিন্তু এখন আর সে পরশুরামের দিকে অসঙ্কোচে তাকাইতে পারিল না। মুখখানা ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেই শ্রদ্ধাভাজন আর এক ব্যক্তির সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে কলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল: আমি দেখতে পেয়েচি কাকাবাবু, পরদার পেছনে লুকিয়ে আমাদের কথা শোনা হচ্ছিল,—এখন আসুন এর শাস্তিটা নেবেন, যাওয়া আজ বন্ধ।—কথাগুলি বলিতে বলিতেই সে দরজার দিকে ছুটিল এবং অনারেবল নন্দলাল নস্করের হাতখানা দুহাতে চাপিয়া পিতার দিকে লইয়া চলিল।

আগন্তুককে দেখিয়া পরশুরাম ও মিতু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিপিন ছুটিয়া গিয়া হেঁট হইয়া তাঁহার জুতার ধুলা লইয়া মাথায় ঠেকাইল।

রায় সাহেব স্মিতমুখে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন:

ব্যাপার কি হে, সত্যিই বাইরে দাঁড়িয়ে বেবীর সওয়াল শুনছিলে নাকি? ব'স, ব'স, বেশ সময়েই এসেছ, অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল।

নন্দবাবু কহিলেন: তোমাদের তর্ক শুনেই বুঝেছিলুম, আসর গুলজার, হঠাৎ এলে পাছে রসভঙ্গ হয়, তাই পরদার পেছনেই দাঁড়িয়েছিলুম। আমি পরশুরাম বাবুর সন্ধানে ওঁর আফিসে গিয়েছিলুম, শুনলুম, তুমিই ওঁকে সঙ্গে করে এনেছ। কিন্তু এসে মিতুকেও দেখবো তা ভাবিনি। কবে তুমি এসেছ হে, খবর সব ভাল?

মিতু কহিল: আজ্ঞে হাঁ, আজই আমরা কলাকতায় এসেছি, আপনি ভাল আছেন?

নন্দবাবু কহিলেন: মন্দ কি-! যাক, তোমাকে দেখে খুব খুসী হলুম। ব'স—ব'স।

তার পর পরশুরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন: আপনার আফিসেই আমি—

পরশুরাম মৃদু হাসিয়া কহিল: আপনি আবার কিন্তু ভুল করলেন নস্কর মশাই! মৃত্যুঞ্জয়বাবুর চেয়ে আমি বয়সে, বিদ্যায় বা মানসম্ভ্রমে কিছুতেই বড় নই, অর্থচ ওঁকে স্বচ্ছন্দে তুমি ব'ল্লেন, আর আমার বেলায় আপনি!

অপ্রতিভের মত মুখভঙ্গী করিয়া নন্দবাবু কহিলেন: সত্যিই ভুলে গিয়েছিলুম, তার পর আর দেখা হয়নি কিনা! আচ্ছা, আর ভুল হবে না—

বলিতে বলিতে হঠাৎ পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিপিনের হাতখানা ধরিয়া জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন: এরই মধ্যে গুড বয় হয়েছ দেখছি, পড়া শোনা সুরু হয়ে গেছে—

রায় সাহেব কহিলেন: এর পড়া নিয়েই ত বেধে গেলো তুমুল তর্ক। পরশুরাম বলে, স্কুলে একে দিয়ে ভুল হয়েচে, স্কুলের শেখা বিদ্যের কোন দাম নেই, ওখানকার বিদ্যে শুধু গোলামী শেখায়। মিতু ও-কথা মানতে চায় না, বলে—বাজে কথা। আমার অবস্থা ঘড়ির পেণ্ডুলনের মত, আর বেবী বলে—স্কুলের ত্রিসীমানায় না গিয়েও অনেকে বিদ্যের জাহাজ হয়েচে। এখন এ ব্যাপারে তোমার কি রায় শুনিয়ে দাও ত, ভারি সঙ্গীন সময়ে তুমি এসে পড়েচ হে!

নন্দবাবু হাসিয়া কহিলেন: রক্ষে কর ভাই, আমাকে আর এ ব্যাপারে জড়িও না, তাহলে পরশুরামের ওপর অবিচার করা হবে।

রায় সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন:—কেন?

নন্দবাবু বলিলেন: বুঝতে পারছ না, মিতুরই দল ভারি হবে; আমরা সবাই ইউনিভারসিটির চাপরাস পরেচি, মায় তোমার বেবী পর্য্যন্ত। ওদিকে পরশুরামের মোটেই চাপরাস নেই। কিন্তু পাস না করেও উনি-যে আমাদের চেয়েও পণ্ডিত, এটা প্রতিপন্ন না হলে ওঁর কথাটা আমরা মানতে পারি না, অথচ ওঁকে বলতেও পারিনা যে উনি কথাটা প্রতিপন্ন করুন।

পরশুরাম পুনরায় হাত দুইখানি জোড় করিয়া কহিল: আমি ত আগেই বলেচি, বিদ্যার কোন পুঁজীই আমার নেই, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনে যে সংস্কার ছিল, তাই আমি বলেচি।

মিতু কহিল: বলাটা ত পাস করার মত আর শক্ত নয়, তাই বলতে পেরেচেন। আরো মজা এই—এঁর মতন আনাড়ীরাই বেশী বাহাদুরী দেখাতে যান। বাড়ীতে ঢোকবার গেট্‌-পাস না পেয়েও এরা ভেতরে কি আছে না আছে তাই নিয়ে চেঁচিয়ে দেশ মাথায় করে। এটা হচ্ছে বাঙ্গালী জাতের দোষ—That is the crime of our Be-gali Nation.

মিতুর কথার শেষটুকু বুঝি পরশুরামের মনে বিঁধিল, তাই সে খপ করিয়া কথাটার প্রতিবাদ করিল, দৃঢ়স্বরে কহিল: মস্ত ভুল করলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বলুন—দোষ আমার—এই পরশুরাম পর্ব্বতের। আপনার কথার আঘাতে আমি পর্ব্বতের মতই অটল থাকবো কিন্তু আমার জন্য বাঙ্গালী জাতটাকে অমন করে আঘাত দেবেন না, সেটা আমি সহ্য করতে পারব না, মৃত্যুঞ্জয়বাবু!

মাধুরী কহিল: এইখানেই আমাদের শিক্ষার দোষ কাকাবাবু, বেশী রাগ হলেই আমরা আমাদের ভাষা ভুলে যাই, আর নিজের জাতটার মুখে কালি মাখাই।

মিতুর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল এবং দুই চক্ষু পাকাইয়া সে মাধুরীর মুখের দিকে তাকাইল। কয়েক মাস পূর্ব্বেও এই মেয়েটি নির্ব্বিচারে মিঃ চৌধুরির প্রত্যেক কথাটির সমর্থন করিয়াছে, কত উৎসাহই তখন পাইয়াছে মিতু! আজ কিন্তু তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তোতা-পাখীর মত কতকগুলো মুখস্ত কথা বলিয়া ঐ স্কাউণ্ড্রেলটা তাহাকে এমনই বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে যে—

মিতুর চিন্তাস্রোতে বাধা দিলেন নন্দবাবু, হাসিমুখে কহিলেন:

আমার এই অনুরোধ, তর্কের প্রসঙ্গটা আজ এখানেই শেষ করা যাক, কেন না, আমি বুঝতে পারচি—বেঁকে দাঁড়াচ্চে, কচলাতে কচলাতে কথাগুলোও তেতো হয়ে উঠেচে। এখন অন্য বিষয়ের আলোচনা করা যাক, যখন আমরা আজ এক সঙ্গেই সকলে মিলেছি।

রায় সাহেব কহিলেন: বেবী, তুমি একবার ভেতরে যাও, খবর দিয়ে এসো। সবাইকে যখন পাওয়া গেছে, বিকেলের জলযোগটা—

মাধুরী কহিল: সে ব্যবস্থা ঠিক আছে বাপী, কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটাও বাজাবে, আর জলখাবারের টেবিলে সকলকে যেতে হবে। যিনি 'না' বলবেন, তাঁর সঙ্গেই আমাদের আড়ি হয়ে যাবে। শেষ কথাটির সঙ্গে মাধুরীর বক্রদৃষ্টিটুকু আর সকলকে অতিক্রম করিয়া শুধু পরশুরামের প্রশান্ত মুখখানির উপর নিবদ্ধ হইল।

নির্দ্দেশটুকু কানে ঢুকিতেই পরশুরামকেও কৌতূহলী দৃষ্টিতে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিতে হইয়াছিল, এ অবস্থায় দুই তরুণ তরুণীর দৃষ্টিসংযোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আশ্চর্য্য, মাধুরীর চোখের দিকে এই প্রথম চাহিয়া এমন মর্ম্মস্পর্শী স্বরে পরশুরাম কথা কহিল, মাধুরীর মনে হইল তাহা সত্যই অপূর্ব্ব! পরিচিত অপরিচিত কত যুবার সহিত তাহার ত চোখোচোখি হইয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শ্রীমুখের কত কথাই ত সে শুনিয়াছে, কিন্তু এ ধরণের কথা বুঝি সে এই প্রথম শুনিল। মাত্র দুইটি দিনের দেখা এই ছেলেটি যেন এই পরিবারটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াই তাহার সম্বন্ধে কথা কহিতেছে। তাহাতে জ্বালা নাই, কৃত্রিমতা নাই। দিব্য সহজকণ্ঠেই পরশুরাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল: আড়ি ত সেই সোনা-প্রতিষ্ঠানের

গোটা মানুষ

ফুটপাথের সামনেই হয়েছিল একদিন, তারপর কত কষ্টে ভাব হয়েছে তোমাদের সঙ্গে; আড়ির কথা আর মুখেও এনোও না—লক্ষীটি! আমি বরং খাবারের দুটো ডিস খালি করতে রাজী আছি।

কথাগুলি মাধুরীর ভারি মিষ্ট লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুলকিত হইয়া উঠিল। লজ্জার আড়ষ্টতা তাহার মধ্যে কোনদিনই ছিল না, তাহাকে উপলক্ষ করিযা কোন কথা উঠিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব না দিয়া ছাড়িত না। পরশুরামের কথার উত্তরটাও সে নন্দবাবুর উপর দিযা চালাইযা দিল, কহিল: আপনি তাহলে সাক্ষী রইলেন কাকাবাবু, ডবল ডিস ওঁকে ফিনিস করতে হবে।

নন্দবাবু হাসিয়া কহিলেন: এ বিষয়ে পরশুরামের সত্যিই সৎ সাহস আছে। ফরম্যালিটির তোয়াক্কা ও রাখে না। যখনি বলিছি, মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে পরশুরাম, হয় ত উঠে যাচ্ছিল, অমনি ফের জেঁকে বসে বললে—বেশ ত, আসুন। এই খোলাখুলি ভাবটি আমার ভারি ভাল লাগে।

রায সাহেব কহিলেন: ওর আফিসেও দেখে এলুম এই কাণ্ড! দুটো বেয়ারা ত চা আর খাবার যোগাতে হিমসিম খেযে যাচ্ছে। আমাকেও না খাইযে ছেড়েছে নাকি? হাত পা ধুযে ফ্রেস হযে জলযোগ সেরে তবে আসতে পেরেচি।

নন্দবাবু কহিলেন: সে আমি খুব জানি। আজ ত ও নিজে হাজীর ছিল না, কিন্তু ওর লোকজনের কি পীড়াপীড়ি আমাকে খাওয়াবার জন্যে, অনেক কষ্টে রেহাই নিয়ে এসেছি।

মাধুরী কহিল: ভালই করেচেন, তাহলে আপনার ভাগেও দুটো

ডিস পড়বে কাকাবাবু! পরশুরামবাবুর আফিসের দরুণ একটা, আর এখানকার দরুণ একটা—

মিতু ভাবিয়াছিল, 'পাসে'র ব্যাপারে ধরা পড়িবার পর এই দমবাজ ছেলেটি রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া কথা বন্ধ করিবে এবং এপক্ষও তাহাকে এড়াইতে চাহিবেন, কিন্তু কাজে দেখা গেল যে, পরশুরাম কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হয় নাই বা লজ্জাভাঙ্গার কোনরূপ লক্ষণও তাহার কথাবার্ত্তায় নাই। বরং পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়টি তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিয়া অসহিষ্ণুভাবেই সে এই সময় কহিয়া উঠিল: আমি তাহলে এখন উঠি, কতকগুলো এন্‌গেজমেন্ট আমার আছে—

মুখের কথাটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া মাধুরী মিতুর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিল। রায় সাহেব অমনি সোজা হইয়া বসিয়া প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিলেন: কেন, মাধুরী মা ত আগেই ওয়ার্নিং দিয়েছেন, জলযোগ সেরে তবে ছুটি, নইলে গোলযোগ বাধবে—একবারে আড়ি, তাতে তোমারই আশঙ্কার কথা বেশী হে!

পরশুরাম মিতুর দিকে চাহিয়া কহিল: দেখুন, আলাপ জমে আলোচনায়, কিন্তু সেটা আরো পাকা হয়—এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়ায়। তাই শাস্ত্রকাররা বলেছেন—মধুরেণ সমাপয়েৎ। বুদ্ধিমতী মাধুরী বুঝেই এ ব্যবস্থা করেছেন। আপনার যাওয়া ত হতেই পারে না।

এক সঙ্গে মিতু ও মাধুরীর দৃষ্টি পড়িল পরশুরামের মুখখানার দিকে; যে নির্লজ্জ লোকটিকে মিতু কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না, গায়ে পড়িয়া সেই লোকটির এই আলাপ যে তাহাকে রীতিমত

বিরক্ত করিয়াছে, দুই চোখের জলন্ত দৃষ্টিকেই তাহা সে ব্যক্ত করিতে চাহিল। আর মাধুরী, এই অনাত্মীয় ও অল্প পরিচিত অতিথিটিকে তাহার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত কথা কহিতে দেখিয়া বক্তাটির মুখের দিকে না চাহিয়া পারে নাই। কিন্তু লক্ষিত লোকটির দৃষ্টি তখন অদূরবর্ত্তী বিপিনের দিকে, ইসারায় তাহাকে নিকটে আহ্বান করিতেছিল।

বিপিন কাছে আসিতেই পরশুরাম তাহার পীঠটা চাপড়াইয়া কহিল: আমি কিন্তু প্রত্যেক শনিবারেই এই সময় এসে তোমাকে একজামিন করে যাব বিপিন, তাহলেই বুঝতে পারব—পড়াশুনা তোমার কি রকম এগুচ্ছে।

বিপিন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। মিতু বুঝিল, নির্লজ্জটা এ বাড়ীতে আড্ডা জমাইবার ব্যবস্থাটা পাকা পোক্ত করিয়া লইতেছে।

ইহার উপর রায় সাহেব কথাটার সমর্থন করিয়া যখন বলিলেন: 'এ ত খুব ভালো কথা। তাহলে আজ থেকেই সুরু হোক বিপিন, খাওয়ার পরই পরশুরামকে তোমার একজামিন দেবে।'—তখন মিতুকে স্পষ্টই বুঝিতে হইল যে, এই দমবাজ লোকটার বিদ্যা প্রকাশ হইবার পরও ইহার প্রতি ইহাদের বিশ্বাস কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। কিন্তু সেও মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া ফেলিল যে, এই দিক দিয়াই পুনরায় আঘাত করিয়া এই বাক্‌সর্ব্বস্ব মানুষটাকে সে রীতিমত অপ্রস্তুত করিয়া দিবে।

এই সময় নন্দবাবু পরশুরামকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন: হ্যাঁ, ভাল কথা—যে জন্যে আপনার—না-না তোমার আফিসে গিয়েছিলুম

কোর্টের পালটা, সেটা এরি মধ্যে সেরে ফেলা যাক। বলেই তিনি পকেটের ভিতর হইতে মখমলমণ্ডিত সুদৃশ্য একটি কাসকেট বাহির করিয়া কহিলেন: এর ভেতরে আছে এক জোড়া হীরের ব্রেসলেট। বাজারে যাচানো হয়ে গেচে, এখন তোমার রিমার্কটা পেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।—বলেই পাশের দিকে ঝুঁকে কাসকেটটা পরশুরামের হাতে দিলেন।

রায় সাহেব একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: পরশুরামের হীরের কারবারও আছে নাকি?

নন্দবাবু কহিলেন: জুয়েলারীর দোকান যখন খুলেচে, জহর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় বৈকি। পাথর চিনতে বাজারে পরশুরামের জুড়ী নেই বললেই হয়। পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীর সেই হীরের-কণ্ঠী অদল-বদলের মামলায় পরশুরামের সিদ্ধান্তই জজ মেনে নেন। সেই থেকেই ত জহুরী-মহলে ওর নাম ছড়িয়ে পড়েছে, ভাটিয়ারা পর্য্যন্ত চমকে গেছে, আর পরশুরামেরও কাজ বেড়েছে।

পরশুরামের কানে হয় ত কথাগুলি প্রবেশ করে নাই, কাসকেটটির ভিতরের চমকপ্রদ বস্তু দুটি চোখের কাছে তুলিয়া সে তখন গবেষণায় তন্ময়। দূর হইতে এই অপূর্ব্ব ব্রেসলেট জোড়াটির নির্ম্মাণ পারিপাট্য ও বিচিত্র দ্যুতি মাধুরীকেও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। ব্যাপারটা অবশ্য মিতুর মনঃপুত হয় নাই, তাহার মুখখানা ক্রমশঃই বিকৃত হইতেছিল।

হঠাৎ পরশুরাম উঠিয়া গোল টেবিলখানার কাছে গেল। ইহারই একদিকে বিপিন ও অপরদিকে মাধুরী মুখোমুখী বসিয়াছিল।

গোটা মানুষ

টেবিলখানার মধ্যস্থলে সুদৃশ্য এক বাতিদানে ইলেকট্রিক ফিট্ করা ছিল। বিপিনের পিঠটি আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া পরশুরাম কহিল, তুমি ওখানে গিয়ে বস ত বিপিন, আমার এই জায়গাটা এখন দরকার।

বিপিন তাড়াতাড়ি চেয়ারখানি ছাড়িয়া দিতেই, পরশুরাম সেখানি অধিকার করিয়া মাধুরীর দিকে চাহিয়া কহিলঃ এর সুইসটা খুলে দাও ত মাধুরী। বুঝতে পেরেছ বোধ হয়—আমার একটু চড়া আলোর দরকার হয়েচে।

মাধুরী তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে তাহার চাঁপার কলির মত আঙ্গুলটির টিপ দিতেই আলো জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সে বাতিদানটি ঘুরাইয়া আলোর ডুমটি পরশুরামের দিকে নীচু করিয়া দিল।

প্রত্যাশিত আলোটুকু পাইয়া পরশুরামের মনটি খুসীতে ভরিয়া গেল, অমনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইলঃ বা! ঠিক বুঝেছ ত আমি কি চাই! লক্ষীটি। একেই বলে কাজের মেয়ে।

মাধুরীর চোঁখের দুটি কোণ ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, আলোর উজ্জ্বল আভা তাহার উপর পড়িয়া যদিও মুখের অরুণিমাটুকু সুস্পষ্ট করিয়া দিল, কিন্তু পরশুরাম সে সৌন্দর্য্যটুকু দেখিবার সুযোগ পাইল না, চোখ দুটি পাকাইয়া একাই দেখিল মিতু।

মিনিট কয়েক পরেই পরশুরাম ব্রেসলেট দুইটি কাসকেটে ভরিয়া ডালাখোলা অবস্থাতেই সেটি মাধুরীর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলঃ আমার পর ক্ষা হয়ে গেছে, এবার তুমি দেখতে পার

মাধুরী ; কেননা গয়না পছন্দ করতে মেয়দের একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে।

মাধুরী সুদৃশ্য ব্রেসলেট দুটির উপ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল : গয়না পছন্দ করা আর জহর যাচাই করা ত সমান নয়।

পরশুরাম কহিল : বেশ ত, হাতে করে দেখই না, শেখাত উচিত।

মাধুরী নিরুত্তরে কাসকেটটি তুলিয়া লইয়া ব্রেসলেট দুটির নির্ম্মাণ পারিপাট্য দেখিতে লাগিল। রায় সাহেব এই সময় কহিলেন : বেবীর বিয়েতে ঐ রকম ব্রেসলেট এক জোড়া আমি দেব, বলে রাখছি।

নন্দবাবু কহিলেন : ইচ্ছে করলে এই জোড়াটিই তুমি মাধুরীর জন্যে নিতে পারো, এটাও বিক্রীর জন্যে যাচানো হচ্ছে।

রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন : কত দাম ?

পরশুরাম কহিল : যে দামই হোক, মাধুরী এ ব্রেসলেট পরবে না, ওর বে'তে হীরের ব্রেসলেটই কয়াল মশাই নিশ্চয়ই দেবেন।

নন্দবাবু চমকিত হইয়া কহিলেন : এ কথার মানে? তাহলে এ ব্রেসলেট জোড়াটা কি হীরের নয় ?

পরশুরাম কহিল : আগে আপনি এর বৃত্তান্ত আমাকে বলুন, তার পর আমার কথা বলব।

নন্দবাবু কহিলেন : কলকাতার একটা নামী ঘর থেকে এই ব্রেসলেট-জোড়াটা বিক্রীর জন্যে আসে। আমার এক বন্ধু হাজার

টাকা অ্যাডভান্স করেছেন, আরও দেড় হাজার দিতে হবে; তবে যাচাবার পর দরটা পাকা হবার কথা। বাজারে যাচিয়ে জানা গেছে, হীরেগুলো খুলে বেচলেও তিন হাজার টাকা উঠবে। এর ওপর সোনার দাম আছে। কাল আমার সঙ্গে তাঁর এ সম্বন্ধে কথা হয়। তাঁর ইচ্ছে, দু' হাজারে কিনে কিছু লাভ নিয়ে ছেড়ে দেবেন। আমার কাছে তোমার কথা শুনেই শেষটা যাচাবার জন্যে আমাকে দিয়েছেন। রাত আটটার সময় তিনি আমার বাড়ীতে আসবেন কাল বাকি টাকা দিয়ে কেনা হবে।

পরশুরাম কহিল: এর দাম আড়াইশোর বেশী হতে পারে না।

স্তব্ধ বিস্ময়ে নন্দবাবু কহিলেন: বল কি হে?

পরশুরাম কহিল: আসল হীরের লক্ষণ হচ্ছে তার গায়ে s'rip আর triangular depression থাকবে।

রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন: সেগুলো কি রকম?

পরশুরাম কহিল: গায়ে রেখা চিহ্ন এবং ত্রিকোণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্তকে বলে strip and triangular depression.

নন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন: এ-গুলোতে নেই?

পরশুরাম কহিল: ৫০খানা পাথরের ভেতর চৌদ্দখানায় আছে। কিন্তু এমন কায়দায় বাজে গুলোর ভেতরে ভেতরে এগুলো বসানো হয়েচে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে সবগুলোই এক রকম। এই চোদ্দখানাও আবার খনিজ হীরে নয়, বৈজ্ঞানিক উপয়ে জার্ম্মাণীতে তৈরী কৃত্রিম হীরে। তবে কৃত্রিম হলেও এই চৌদ্দখানাকে ঝুটো বলা চলে না, এগুলোও হীরের গুণসম্পন্ন, এদের গায়েও ঐ রেখা চিহ্ন

আছে, আর খনিজ হীরের মত এগুলোকে অম্লজানে পোড়ালে কার্ব্বলিক অ্যাসিড গ্যাস উঠবে। কিন্তু বাকিগুলো একবারে কাচ, কোন দামই এদের নেই।

নন্দবাবু অবাক হইয়া পরশুরামের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। মাধুরী কাসকেট হইতে একটি ব্রেসলেট তুলিয়া সকৌতুকে আগ্রহের সুরে প্রশ্ন করিল: তাহলে এটায় যে পঁচিশখানা পাথর সেটকরা রয়েছে, এদের মধ্যে সাতটি ভালো, গায়ে দাগ আর গর্ত্ত আছে?

পরশুরাম কহিল: হ্যাঁ।

মাধুরী কহিল: কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না ত?

পরশুরাম একটু গভীর হইয়া কহিল: আগে অক্ষর না চিনলে বইয়ের লেখা কি পড়া যায় মাধুরী? এরও যে বর্ণ পরিচয় আছে, সে সবও শিখতে হয়।

ঠিক এই সময় ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল, মাধুরী অমনি সচকিত হইয়া উঠিয়া কহিল: উঠুন সবলে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

সাত

ড্রয়িং রুমের পিছনেই সুপ্রশস্ত ভোজন গৃহ। মধ্যে সুদীর্ঘ টেবিল, উপরে সাদা চাদরের আস্তরণ, চারিধারে চেয়ার। ডিসে সাজানো নানাবিধ খাদ্য এবং পিয়ালা ভরা চা।

বাড়ীর সুদক্ষ পাচক পরিবেষণ করিতেছিল। মাধুরী প্রথমে সারে বসিতে চাহে নাই, কিন্তু নন্দবাবু তাহাকে রেহাই দেন নাই,

তাহাকেও বসিতে হইয়াছে। মাধুরীকে মাঝে রাখিয়া দুই পাশে দুই বন্ধু বসিয়াছিলেন, অন্যদিকে মিতু, পরশুরাম ও বিপিন। ভোজনের সঙ্গে হীরকের প্রসঙ্গটিও চলিল। নন্দবাবু একটু চিন্তিত ভাবেই বলিলেন: কোন জহুরীই কিন্তু জোর করে এ-রকম গলদের কথা বলতে পারে নি। আমার বন্ধুটি ত দেখছি শুনে আকাশ থেকে পড়বেন।

ইহার পর পরশুরাম যখন কহিল: দু-পক্ষকেই সোমবার আমার আফিসে আনবেন, আমি হাতে কলমে গলদ দেখিয়ে দেব।—তখন এই কথাটাই পাকা করিয়া নন্দবাবু আর এক কথা পাড়িলেন। খাবার টেবিলে বসিয়া শুধু খাদ্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে ইনি অভ্যস্ত নন, এই সঙ্গে নানারূপ আলোচনা চাইই। হঠাৎ কহিলেন,—হ্যাঁ, এক বন্ধুর হীরে-পর্ব্ব ত খতম হল, এবার আর-এক বন্ধুর কাব্য পর্ব্ব হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তার মীমাংসা করতে হবে মিতু আর মাধুরীকে।

মিতু আর মাধুরী উভয়েই নন্দবাবুর দিকে এক সঙ্গে চাহিল। নন্দবাবু কহিলেন: আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি সি আই-ডি অফিসার। সরকারের ভারি পেয়ারের লোক। তাঁর এক ছেলে ম্যাট্রীক পর্য্যন্ত পড়ে মা-সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে বাড়ীতে বসেই এতদিন আরামে দিন কাটাচ্ছিল, পুলিশ কমিসনারের কাছে সুপারিশ করে তার বাবা সেদিন তার জন্যে পুলিস-লাইনে এক চাকরী বাগিয়েছেন, আসছে সোমবার সেই পোষ্টে তার জয়েন করবার কথা। কিন্তু ছেলেটা এর ভেতরে এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে

নিজের হবু চাকরী আর বাপের পাকা চাকরী দুটোই টলিয়ে দিয়েছে।

সকলেই উৎকর্ণ হইয়া নন্দবাবুর এই গল্পটি শুনিতেছিলেন। রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন: কি ফ্যাসাদ বাধালে?

নন্দবাবু কহিলেন: গত পরশু দিন কমিসনার সাহেব আমার বন্ধুকে ডেকে একখানা বাংলা মাসিক কাগজে ছাপা একটা কবিতা দেখিয়ে যে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন, তাতেই তার চক্ষুস্থির। কাগজখানার নাম 'ছারখার', তার গোড়াতেই যে বাংলা কবিতাটা ছাপা হয়েছে—তার হেডিংটার নাম—'থ্রো-য্যাওয়ে' (Through away), আর লেখক হচ্ছে আমার বন্ধুর সেই ছেলে—কমিসনার সাহেব যাকে চাকরী দিয়েছিলেন। কবিতার বাংলা বয়ানগুলোর ইংরিজী তরজামা করে একটা শি[illegible] এঁটে ঐ কাগজখানার সঙ্গে কোন হিতৈষী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে জানিয়েছেন—যে কবিটিকে তিনি সরকারের চাকরীতে বাহাল করেছেন, তিনি একজন কি রকম উঁচুদরের 'এনার্কিষ্ট' তাঁর কবিতা থেকেই তার নমুনা পাবেন। বন্ধু ত একবারে আকাশ থেকে পড়লেন। তার ছেলেকে যে কাব্যি ব্যাধি ধরেছে, মাসিক কাগজে তার লেখা কবিতা ছাপা হয়—এর কোন হদিসই তিনি পাননি কোনদিন। কাজেই সাহেবকে খুসী করবার মত কোন জবাব দিতে পারলেন না। সাহেব তাঁকে শুধু এইটুকু জানিয়ে দিয়েছেন—'সত্যই যদি তোমার ছেলের মন এখন থেকেই জিন্দাবাদীভাবে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে এ-চাকরী ত তাকে দেওয়া হবেই না, বরং তার ওপর সরকারকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে

হবে, আর তোমার অবস্থাও তাতে খুব সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে। সোমবার বেলা দশটার সময় তুমি তোমার ছেলেকে আমার সামনে হাজির করবে, আর তাকে বলবে—সে যেন এর রীতিমত কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে!'

নন্দবাবু বিস্ময়ের সুরে কহিলেন: কি সর্ব্বনাশ! বেচারী ত কবিতা লিখে মস্ত ফ্যাঁসাদে পড়েচে! হ্যাঁ, তার পর কি হল?

নন্দবাবু কহিলেন: বাড়ী গিয়েই বন্ধু তাঁর ছেলেকে ডেকে সমস্ত বলে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার? ডুবে ডুবে এ রকম করে কদ্দিন থেকে জল খাওয়া হচ্ছে? এখন যে চাকরী নিয়ে টানাটানি!' ছেলে তখন সব কথা খুলে বললো। সে একটা গল্প! খবরের কাগজে এক দুস্থ কবি নাকি এই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—অ-কবিকে তিনি সদ্য সদ্য 'কবি' করে দিতে পারেন। ছেলে বেচারীর মনে মনে কবি হবার সাধটুকুও ছিল। বিজ্ঞাপনে কবি নাম দেন নি। পোষ্ট-বক্স নম্বর ধরে চিঠি দিতে জবাব এলো দেখা করবার। তার পর কথা হল, কবির লেখা নতুন কবিতা টাকা দিয়ে কিনে নিজের নাম দিয়ে ক্রেতা কাগজে বার করতে পারবে, লোকে জানবে কবিতার লেখক সে-ই। কবি আর সে ছাড়া ব্যাপারটা অপর কেউ জানবে না, কবিও কাউকে বলবে না। এক একটি কবিতার জন্য কবিকে পঁচিশটি করে টাকা দক্ষিণা দিতে হবে। নগদ একশোখানি টাকা দিয়ে যে চারটি কবিতা ছেলে-বেচারী কিনেছিল, তারই প্রথমটি 'ছারখার' কাগজে এই প্রথম বেরিয়ে এ রকম বিভ্রাট বাধিয়েছে। কবি নাকি বলেছিলেন, প্রথম কবিতাটি

এমন একটা ইংরেজী কবিতার ভাব নিয়ে লেখা, এ পর্যান্ত বাংলায় যার তর্জ্জমা কেউ করেনি। বাকি তিনটি তাঁর নিজের পরিকল্পনা। এখন কথা এই—মুল ইংরেজী কবিতাটি যদি পাওয়া যায়, তাহলে ল্যাটা চুকে যায়, সাহেবকেও ওটা ইংরেজী কবিতার তর্জ্জমা বলে ঠাণ্ডা করে দেওয়া চলে। কিন্তু সে-গুড়েও বালি পড়েচে।

রায় সাহেব কহিলেন: কেন, কবির কাছ থেকে ত নাম জেনে নিলেই গোল মিটে যায়।

নন্দবাবু কহিলেন: কবিকে পেলে ত! তিনি মনের দুঃখে সম্প্রতি পোটাসিয়াম সায়োনায়েডের শরণ নিয়ে পরপারে পাড়ি দিয়েচেন। তার পর দুদিন ধরে হেন কবি নেই যার কবিতা সার্চ্চ না করা হয়েচে, কিন্তু পাত্তা কোথাও মেলেনি। অথচ কথাটা বাইরে জানাজানি হয়—ছেলের তা ইচ্ছে নয়।

মিতু জিজ্ঞাসা করিল: কবিতার ফ্যাক্টটা কি বলতে পারেন?

মাধুরী কহিল: ফ্যাক্ট কেন, কবিতাটিই আমাদের শুনিয়ে দিননা কাকাবাবু!

নন্দবাবু কহিলেন: সেও ত সঙ্গে নেই মা, আর এমন শ্রুতিধর কস্মিনকালেই ছিলুম না যে, কবি কালিদাসের মত একবার শুনেই কণ্ঠস্থ করে ফেলবো। ফ্যাক্টটুকু মনে আছে। কবি বলছেন—'ফুল ছিঁড়ে ফেলে দাও, যেমন তেমন গান গেওনা, চিরকেলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গাও বিদ্রোহের গান।' কবিতার বিষয়বস্তুটা মোটামুটি এই।—কিন্তু বিলেতের কোন্ কবি যে এই ধরণের কবিতা লিখেচেন, আমার যেটুকু পড়াশোনা আছে, তাতে ত

পেলুম না; এখন তোমরা দুজনে যদি কবিকে বার করতে পারো, তাহলে বলবো—হ্যাঁ, তোমাদের পড়াটাই বড়ো।

ভোজনের সঙ্গে স্মৃতি সমুদ্রে মন্থন-দণ্ড পড়িল, কিন্তু এই ধরণের কোনও কবিতা কাহারো মগজে ভাসিয়া উঠিল না।

পরিপূর্ণ দুইটি ভোজনপাত্র সর্ব্বাগ্রে নিঃশেষ করিয়া পরশুরাম সহসা কহিল: কবিতার নাম Through away বললেন না?

মুখের ভোজ্যটুকু মুখেই রাখিয়া নন্দবাবু অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলেন: হ্যাঁ, ঐ নাম। তোমার জানা আছে নাকি পরশুরাম?

এবার সকলের দৃষ্টি পড়িল পরশুরামের দিকে, তন্মধ্যে মিতুর মুখে বিদ্রূপের হাসিটুকু সুস্পষ্ট হইল। পরশুরাম কহিল: কবি দেখছি তাহলে পুকুর চুরিই করেচেন। কিন্তু এ অপরাধ তাঁর একলার নয়, সাহিত্যের বাজারে চোরাইমালের এরকম ব্যাপার অনেকেই চুটিয়ে চালিয়েচেন দেখতে পাই।

নন্দবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন: তুমি কি তাহলে মূল কবিতা আর তার কবির হদিস্ পেয়েছে নাকি?

পরশুরাম কহিল, কবিতার যে নাম আর যেটুকু ফ্যাক্ট শুনলুম, তাতে মনে হচ্চে, আমার অনুমান ঠিক। মূল কবিতারও নাম—'Through away'—কবি হচ্চেন ইংলণ্ডের এক ইংরেজ নারী, নাম তাঁর এলিজাবেথ দারুস।

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দবাবু কহিলেন: কবিতাটি জানা আছে?

পরশুরাম কহিল: কিছু কিছু আছে। আমার ভালো লেগেছিল বলেই বোধ হয় ভুলিনি, মনে আছে।

আগ্রহের স্বরে নন্দবাবু কহিলেন : বল, বল, শুনি।

পরশুরাম সুস্পষ্ট ও উদাত্তকণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণ-ভঙ্গীতে কবিতাটি আবৃত্তি করিল—

Through away the flowers,
the tender songs ;
attune your powers
to eternal wrongs ;
have but hopeless hard
rebellion for bard.

* * * *

Ah, this is not enough, I cry—
I too on action's stormy sea,
Am fain to fight and further me,
To make that heaven my home.

* * *

Blow celestial wind
Of warmth and stress,
Wake the world's loath mind
To loveliness,

এই পর্যান্ত বলিয়াই পরশুরাম কহিল : আপনার ফ্যাক্টের সঙ্গে মিলবে নম্বর মশাই ?

নন্দবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন : অবিকল। তাহলে এ কবিতার বইখানাও তোমার কাছে বোধ হয় আছে পরশুরাম ?

পরশুরাম কহিল : নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া ম্যাকমিলান কোম্পানী এ বই ছেপে বার করেচেন।

নন্দবাবু কহিলেন : সে সোমবার আনানো যাবে, কিন্তু তোমার বইখানা আজই আমার চাই, আমি তোমার সঙ্গে গিয়েই নিয়ে আসব, আমার বন্ধু বেচারী দু-রাত্তির ঘুমায়নি, এ কষ্টটুকু থেকে তাকে তুমিই আজ নিষ্কৃতি দেবে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে পরশুরামের দিকে চাহিয়া রায় সাহেব কহিলেন : এখন বুঝতে পারছি পরশুরাম, তুমি সত্যিই জিনিয়াস, সব দিক দিয়েই অসাধারণ তুমি ; একটি একটি করে তুমি যেন তোমার ক্ষমতা-গুলো আমাদের চোখের সামনে খুলে দিচ্ছ।

পরশুরাম মৃদু হাসিয়া কহিল : আসলে কিন্তু মোচার খোলা, শেষ পর্য্যন্ত গেলে দেখবেন—কিছু নেই। তবে এইটুকু আমার সান্ত্বনা যে, পাস করিনি বটে, কিন্তু পড়িচি, আর এখনো পড়চি ; যদিও শিখতে কিছুই পারিনি।

মাধুরী এইবার তাহার আয়ত দুইটি চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি পরশু-রামের মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিল : আমার একটা অনুরোধ কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে।

পরশুরাম কহিল : তুমি কি বলবে আমি বুঝতে পেরেচি মাধুরী, বিপিনকে আর স্কুলে পাঠাবে না, আমার টোলেই তাকে ভর্ত্তি করে

দেবে, অর্থাৎ আমাকে তার গুরুমশাই হতে হবে।—এই অনুরোধই ত তুমি করবে?

মাধুরী কহিল: কতকটা তাই, কিন্তু বাকিটুকু আপনি ধরতে পারেন নি। যদি অভয় দেন, তাহলে বলি।

পরশুরাম স্নিগ্ধদৃষ্টিতে মাধুরীর স্বচ্ছ মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল: নিশ্চয় তুমি এমন কিছু বলবে না মাধুরী, আমার পক্ষে যেটা স্বীকার করা কষ্টকর হবে।

মাধুরী কহিল: কষ্ট নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সেটা কাটানোও কঠিন হবে। কথাটা এমন মারাত্মক কিছু নয়, বলি তবে শুনুন—কাল থেকে আমিও কলেজ ছেড়ে দেব।

—কলেজ ছেড়ে দেবে?

প্রশ্নটি যদিও পরশুরামের কণ্ঠ দিয়া নির্গত হইল, কিন্তু বিস্মিত করিয়াছিল সকলকেই।

মাধুরী ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল: হ্যাঁ। কলেজে আর যাব না। আপনার কথাগুলো যে কত সত্য, আজ তা স্পষ্ট বুঝিছি। সত্যিই, কলেজে শিক্ষা কিছুই পাইনি, শুধু অর্থের শ্রাদ্ধ করেচি, বিস্তর কথা মুখস্থ করেচি, আর কতকগুলো অভাবকে বাড়িয়ে তুলেছি। এবার বেচে গণ্ডূষ করবো, কিন্তু শিক্ষার ভার নিতে হবে আপনাকে।

—আমাকে!

—হ্যাঁ, এই সর্ত্তেই আমি কলেজ ছাড়চি।

পরশুরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল: কিন্তু আমারও

একটা সর্ত্ত আছে, যদি স্বীকার কর, তাহলে তোমার শিক্ষার ভার আমি নিতে পারি।

দুই চক্ষু মেলিয়া পরশুরামের দিকে চাহিয়া মাধুরী কহিল: বলুন আপনার সর্ত্ত, শিক্ষার অনুরোধে নিশ্চয়ই আমাকে তা স্বীকার করতে হবে।

পরশুরাম কহিল: তুমি যে বুদ্ধিমতী, এ বিশ্বাস আমার আছে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেচ, তোমার বাবা আমাকে যখনই তাঁর ছেলের স্থানটুকু ছেড়ে দিয়েচেন, তখনি আমাকে মেনে নিতে হয়েচে তুমি আমার ছোট বোনটি, সেই জন্যই এমন অসঙ্কোচে আমি তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি। আমি যদি তোমার শিক্ষার ভার নিই মাধুরী—তোমাকেও কিন্তু নির্ব্বিচারে এই সত্যটুকু মেনে নিতে হবে—আমি তোমার দাদা, আর তুমি আমার ছোট বোনটি। এই সম্বন্ধই বরাবর আমাদের থাকবে—ছোট বোনটির স্নেহ আর শ্রদ্ধাটুকুই তোমার ব্যবহারে আমি প্রত্যাশা করব।

তাড়াতাড়ি হাতখানি মুছিয়া আঁচলটি গলায় দিয়া মাধুরী গাঢ়স্বরে কহিল: আমি আপনাকে আগেই চিনিচি। আমার দাদা নেই, আজ থেকে জানলুম—আপনি আমার বড়দা'।

মিতুও এই সময় তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভাবাদ্রস্বরে কহিল,—আমাকেও আপনি মাপ করুন পরশুরাম বাবু, আমি আপনাকে চিনতে না পেরে মনে মনে হিংসে করেছিলুম। আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে জব্দ করবার কত কি মতলব আঁটছিলুম, কিন্তু এখন বুঝছি, আমাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, আপনি আদর্শ মানুষ, আর আমি

নামেই মানুষ; ওপরটা খোলস পরা, ভেতরটা ফাঁফেরা। আজ থেকে আপনিও আমার দাদা, শুধু তাই নয়—ছোট ভায়ের অসম্পূর্ণ শিক্ষাটুকু আপনাকেই পূর্ণ করবার ভার নিতে হবে দাদা!

পরশুরাম স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল: আমাকে অত বাড়িয়ো না ভাই, তবে দাদা যখন বলেছ—দাদার মতই আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী হব সব বিষয়েই, এ তুমি স্থির জেনো।

মিতু কহিল: তাহ'লে স্বীকার করুন দাদা, আমার বাবা আর ঠাকুরদাদা যে সব ভুল করে গেচেন, সেগুলোও আপনি ভুলে যাবেন, আমার দাদা হয়ে সুধরে দেবেন?

পরশুরাম দুই হাতে মিতুকে তাহার বিশাল বুকখানার দিকে টানিয়া কহিল: বিধাতা যে অনেক আগেই সে যোগাযোগ করে দিয়েছেন মিতু, শেষকৃত্য করে আমিও যে চৌধুরী মশায়ের বড় ছেলের মতই হয়ে আছি। এবার দুই ভাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংস্কারের আলোয় পুরোনো ভুলগুলো সুধরে নেব বৈকি।

নন্দবাবু কহিলেন: খুব শুভক্ষণেই এখানে আজ এসেছিলুম কালী, শুভলগ্নে একটা ভালো রকমের যোগাযোগ হয়ে গেল।

রায় সাহেব কহিলেন: কলেজের কথা মনে আছে নন্দ, আমাদের প্রফেসর ব্যানার্জ্জী বলতেন—প্রকৃত পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বীরত্ব। সে গুণটুকু পরশুরামের চরিত্রে পুরোমাত্রায় আছে।

নন্দবাবু কহিলেন: পরশুরাম নিজেই যে সমস্ত গুণের আধার, ও যে সত্যিকার মানুষ কালী, আমাদের সমাজ আর জাতের ভেতরে ঐ হচ্ছে—গোটামানুষ।

শেষ

—এই লেখকের অন্যান্য বই—

কথা-সাহিত্য

স্বয়ংসিদ্ধা	...	২॥০
কুমারী-সংসদ	...	২॥০
নারীর রূপ	...	৩৲
নতুন বউ	...	২॥০
অদৃষ্টের ইতিহাস	...	২৲
জাগ্রতা ভগবতী	...	১॥০
ভুলের মাশুল	...	১॥০
মরুর মাঝারে বারির ধারা	...	১॥০
দুঃখের পাঁচালী	...	১॥০
হুইপ	...	২৲
আত্মসমর্পণ	...	২॥০
ইন্টেলিজেন্ট	...	২॥০
অজানা অতিথি	...	২৲
অবশেষে	...	২৲
দরিদ্রের দাবী	...	২॥০
দ'খনে বাঘ	...	৩৲
আলো ছায়ার খেলা	...	২॥০
গল্পাঞ্জলি (প্রতি পর্ব্ব)	...	১॥০

নাট্য-সাহিত্য

নাট্য-ভারতী (প্রতি পর্ব্ব)	...	১॥০
বাজীরাও (নবম সংস্করণ ঃ ষ্টারে অভিনীত)		১৲
(আধুনিক পরিকল্পনায় পরিশোধিত নবতম সংস্করণ)		১॥০
অহল্যাবাঈ	(ষ্টারে অভিনীত)	১৲
জাহাঙ্গীর	(মনোমোহন)	১৲
মহামানব	(রঙ্গমহল)	১৲
বাসুদেব	(ষ্টার)	১৲
অন্নপূর্ণা	(মিনার্ভা)	১।০

শিশু-সাহিত্য

গল্পদাদুর বৈঠক	...	১॥০
বাংলার দুলাল	...	১৲
মন্দ থেকে ভাল	...	৸৵০
ছোট থেকে বড়	...	৸৵০
নির্ব্বাসিতা রাজকন্যা	...	৫৲
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী	...	২॥০